সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে

(দ্বিতীয় খণ্ড)

নিগূঢ়ানন্দ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

ভাদ্র ১৩৬৬

প্রকাশক

রামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৬

মুদ্রাকর

যামিনীভূষণ উকিল

দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৯এ, বিধান সরণী

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

ছোটবেলার স্মৃতির তাগিদে আমার ভেতরে কি যে এক অপ্রতিরোধ্য প্রবল কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে কে জানে। 'সাপই সব' একথাটুকু আমায় যেন পাগল করে তুলেছে। এজন্য সন্ধান তো কম করিনি। নানা তান্ত্রিকের সংস্পর্শেও এসেছি। তাঁদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড কিছু কিছু না দেখেছি তাও নয়। কিন্তু সর্পরহস্য আমার কাছে ভেদ হয় নি। হরিদ্বারে বেড়াতে গিয়ে লছমনঝুলায় ছিলাম কিছুদিন। উত্তুঙ্গশিখর লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতাম। শুনেছিলাম পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথ এটা। সেইজন্যই কৌতূহলের সীমা ছিল না। যদিও আমি জানতাম এই পথ ধরে কেদারবদ্রী পর্যন্ত যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় তবুও এগিয়ে যেতাম। আমার দুর্বোধ্য মনের এ এক অপার কৌতুক সন্দেহ নেই। চলতে চলতে পথের দুধারে স্মরণাতীত কাল থেকে বয়ে আসা নানা লিখিত ও অলিখিত ইতিহাসের গন্ধ পেতাম যেন। সেই গন্ধ পেতাম আর নিজের মধ্যে অদ্ভুত এক রহস্য অনুভব করতাম। সেই অতীন্দ্রিয় পরিবেশে একদিন দুধচটির কাছে পথের বাঁকে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধকের দর্শন পেলাম। তাঁর হাবভাবে কথাবার্তায় এইটুকুই আমার মনে হয়েছিল যে, সর্প-রহস্যের গোপন খবর তিনি জানেন। আমি সারা জীবন ধরে যে সর্প-তান্ত্রিকের সন্ধান করে বেড়াচ্ছি ইনি তাঁদেরই মধ্যে একজন। তাঁর পাণ্ডিত্যও যে অপরিসীম সে বিষয়েও কিছুমাত্র দ্বিধা থাকেনি আমার। সর্পরহস্যের গভীর তাৎপর্য তিনিই আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রথমটা আমার মনে হয়েছিল, অনেকটা বুঝেছি, ধরতে পারব। তারপর তিনি যখন তন্ত্রের গভীরে চলে গেলেন তখনই সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল আমার। ক্রমশ বিষয়টি দুরূহ ও অস্পষ্ট হয়ে উঠল। তবুও হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম যদি সবটা তাঁর কাছে শুনতে পেতাম। কিন্তু শব্দ ও মন্ত্রের তাৎপর্য আমার কাছে ব্যাখ্যা

করার পরই এমন আশ্চর্যভাবে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন যে, সমস্ত বিষয়টাই আমার কাছে কেমন গুলিয়ে গেল। ধাঁধা শুধু ধাধাই থাকল না। আরো অস্পষ্ট ও রহস্যময় হয়ে উঠল। আমার কৌতূহল যেন আরো প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু অতীন্দ্রিয় জগতের চাবিকাঠি হাতে না থাকলে অসহায়ের মত মনের মধ্যে কৌতূহলের কামড় সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কি? কি করব, কোথায় যাব বুঝতে না পেরে নিজের মনের মধ্যেই কিছুদিন একটা যন্ত্রণা বোধ করলাম। এখন শহরবাসী। জীবিকার জন্য কর্মব্যস্তও থাকতে হয়। ইচ্ছে হলেই কৌতূহলী মন নিয়ে যে দেশ-দেশান্তরে পাড়ি জমাব তার উপায় নেই। সুতরাং অশান্ত মনকে শান্ত করার জন্য আমার সেই সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতাটুকুকেই কাজে লাগাবার চেষ্টা করলাম। তারই ফলশ্রুতি হল আমার 'সর্প-তান্ত্রিকের সন্ধানে' প্রথম খণ্ড। কিন্তু এতেও স্বস্তি নেই, পরিতৃপ্তিও নেই। বরং বেশী রকম অস্বস্তিতে আছি। এ-অস্বস্তির কারণ অক্ষম কলমে এর আত্মপ্রকাশ। শুধু লিখলেই হয় না; লেখাকে শিল্পোত্তীর্ণ করতে হয়। সেজন্য যে সহজাত প্রতিভার দরকার আমার তা নেই। সেইজন্যই অস্বস্তি। আমার কৌতূহল হয়তো পাঠকের কাছে হাস্যাস্পদ ঠেকবে। তবে মাঝে মাঝে এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করি যে—'সত্যই' এর প্রতিপাদ্য বিষয়, কল্পনার বিস্তার নয়, সাহিত্যও নয়। সুতরাং যেভাবে সেই নিবিড় রহস্যের সন্ধানে এগুব, সে সম্পর্কে জানতে পারব, সেইভাবে গ্রন্থাকারে তার প্রকাশ হবে। সাহিত্য যার হাতে হবার নয়, শিল্প-সাহিত্যের মান নিয়ে তার আর চিন্তা করে লাভ কি? সেইজন্য শুধুমাত্র কৌতূহলের তাড়নাতেই দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য কলম ধরেছি।

জানিনা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের কাটতি কিরকম হবে বা হচ্ছে। ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে সত্যের আত্মপ্রকাশ নির্ভরশীল নয় এরকম ধারণাই আমার মধ্যে টিকে থাক। না হলে কলম ধরে আর এগুনো যাবে না স্পষ্টই বুঝতে পারছি। তবে এই দুশ্চিন্তার মধ্যেও যে আশার আলো মাঝে মাঝে এসে উঁকি না দিচ্ছে তা নয়। আমার ধারণা ছিল,

এ গ্রন্থ পাঠ করবেন জরাজীর্ণ বার্ধক্যপীড়িত ব্যক্তিরাই আমারই মত যাঁদের শিল্পরুচি কম কিন্তু সত্যকে জানার কৌতূহল বেশী। জীবনের শেষ পর্যায়ে একমাত্র তাঁদেরই মনে সত্য সম্পর্কে প্রবল কৌতূহল জন্মায়। তাঁরা তথাকথিত সাহিত্যের মান সত্যসন্ধানী গ্রন্থের মধ্যে খুঁজেন না। তরুণ সমাজ এ গ্রন্থের প্রতি নিতান্ত বিরূপ হয়ে থাকবে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে একদিন দেখলাম যে আমারই এক পরিচিত তরুণের হাতে একখানি সাধক-কাহিনী। লেখক আমারই মত অখ্যাত। দেখে প্রচণ্ড কৌতূহল হল। লোভ সামলাতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের তরুণ সমাজেও কি ধর্ম সম্পর্কে কৌতূহল দেখা দিয়েছে?

—সে বলল, দেখা দিয়েছে মানে! প্রচণ্ড ভাবে।

আমি বললাম, সে কী কথা! অধিকাংশকেই তো দেখতে পাই রকে; অনেককে বন্ধুবান্ধবীর হাত ধরে, কিছুসংখ্যককে ক্যারিয়ার তৈরির জন্য যান্ত্রিক লেখাপড়ায়, কিছুসংখ্যককে রাগী ছোকরা হয়ে আধুনিক কবিতা লেখায় প্রিফেস-পড়া বিদ্যা নিয়ে পাণ্ডিত্যের অভিমানে। বড় বড় কাগজের ইয়ং লেখকদের দেখতে পাই সুরা পানে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে এবং নিজেকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' একথা ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে। ধর্ম সম্পর্কে তরুণ সমাজে কোন আগ্রহ আছে বলে তো আমার ধারণা ছিল না!

সে বলল, না, যাদের কথা বলছেন, তরুণ সমাজের মধ্যে বিরাট এক সংখ্যা তাদের এখন পছন্দ করে না। সেই জীবনধারণের পদ্ধতিও তাদের মনঃপূত নয়।

বললাম, তাহলে এত অশ্লীল সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার কেন?

সে বলল, এখন আর নেই। গল্প উপন্যাসের প্রতি পাঠকের মনে এখন কৌতূহলের অভাব।

—কেন?

—নিশ্চয়ই লেখকরা তাদের আর তৃপ্ত করতে পারছেন না ভাই।

—তাহলে কোন্ ধরনের বই তাঁরা পড়াশুনা করছেন?

—নিজের হাতের বইখানা দেখিয়ে সে বলল, এই ধরনের।

—তার মানে?

—পাঠকদের কৌতূহল পাল্টেছে।

—না ইকনমিক ডিপ্রেসনে চিরকাল ভারতবর্ষে যা হয়েছে, তাই?

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ তাঁরা অতিপ্রাকৃতে নির্ভর করতে আরম্ভ করেছে?

তরুণটি বলল, ইউরোপ আমেরিকাতেও আমাদের দেশের মত অর্থনৈতিক অবস্থা হয়েছে বলে আপনি মনে করেন নাকি?

বললাম, না, তা করি না। যদিও তাদের অবস্থাও আগের মত তেমন আর ভাল নেই, তবু আমাদের চেয়ে অনেক ভাল।

সে বলল, তাহলে তাদের মনে সত্য সম্পর্কে এমন আগ্রহ কেন?

—কৈ?

—আমাদের দেশের পথেঘাটে এই যে এত হিপি দেখতে পান, এরাই তো সত্যসন্ধানী।

বললাম, সেকি! অনেককে তো বলতে শুনি এরা গঞ্জিকা পিয়াসী, কেউবা ইনফর্মার, কেউবা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার!

তরুণটি বলল, না। ওদের দু একজনের সঙ্গে কথা বলে দেখলে দেখবেন, ওরা অনেকেই বাস্তব সভ্যতায় ক্লান্ত হয়ে অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধানে সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে বেরিয়েছে। মায়াপুরের তরুণ ইউরোপীয় বৈষ্ণবদের দেখবেন; দেখবেন তাঁদের অপরিসীম পাণ্ডিত্য। ভারতবর্ষে সত্য নিহিত আছে বলেই তাঁরা এদেশে এসেছেন।

জানি না। তথাকথিত হিপি বা ইউরোপীয় তরুণদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। এদের সম্পর্কে কিছুই জানি না। তবে ইউরোপের বোধহয় ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে। তন্ত্র সম্পর্কে নাকি তাদের আগ্রহ প্রচণ্ড। কেন এই আগ্রহ জানি না। ওদের চরিত্রের সঙ্গে তন্ত্রের বোধ হয় কোথাও একটা সম্পর্ক আছে। তন্ত্র পড়ে যতটুকু জেনেছি তা থেকে আমার ধারণা, পশ্চিম ইউরোপের শিল্প সাধনার অনেক কিছুই তন্ত্রের চিন্তার সঙ্গে সমান্তরাল। লোকে হাসবে,

নইলে আমার ধারণা, পশ্চিমের জীবন্ত নগ্নতার সাধনা বা ন্যুড মডেলকে কেন্দ্র করে যে নগ্ন-চিত্র অঙ্কন, তার মধ্যে তন্ত্রের মৈথুন তত্ত্বের প্রভাব আছে। আমাদের দেশের অশ্লীলতার সঙ্গে পশ্চিমের ন্যুড সাধনার আকাশ-জমিন ফারাক। তন্ত্রের সঙ্গে কোথায় ওদের যেন সহজাত একটা মিল আছে। সেইজন্যই বুঝি আমাদের দেশের অখ্যাত তন্ত্র-লেখকের লেখা সম্পর্কেও ওদের কৌতূহলের অন্ত নেই। তন্ত্র সম্পর্কে যে-কোন ভারতীয় লেখকের লেখাই নাকি ওদেশের ইণ্ডোলজিস্টরা কিনে পড়েন। তা যদি হয়—ধনপ্রাচুর্যে সমৃদ্ধ ইউরোপেরই যদি ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে প্রবল কৌতূহল দেখা দেয়, তাহলে ভারতবর্ষের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের মনে, এমনকি তার তরুণদের মধ্যেও যে সত্য সম্পর্কে কোন কৌতূহল দেখা দেবে না তা নয়, বরং এ-দেশে সেটা আরও বেশী করে সম্ভব। অবশ্য এদেশ এবং ওদেশের কৌতূহলের মধ্যে একটা পার্থক্যও আছে। ওদেশে সত্যকে আয়ত্ত করার আগ্রহ প্রবল। এদেশে সত্যের দোহাই দিয়ে কাজ হাসিলের চেষ্টা। ধর্ম বুঝবার আগ্রহ এদেশের লোকের কম। ধর্মের নামে কোন গুরু ধরে সহজে পার পাবার চেষ্টা। এদেশের মানুষের এই দুর্বলতা থেকেই এদেশে গুরুবাদের জন্ম। ফাঁকি দিয়ে পার পাবার চেষ্টাতেই তীর্থে তীর্থে এত ভিড়। যাই হোক অশ্লীল সাহিত্যের শেষে আবার যে অন্তত ভিন্ন জগতে পাঠকের মন ফিরেছে, তা জেনেই আনন্দ।

সুতরাং আমার অক্ষমতার কথা চিন্তা করে যতটা ভয় পেয়েছিলাম, ভাবলাম, সমস্ত ব্যাপারটা ততটা ভয়াবহ নাও হতে পারে।

একদিন বই পাড়াতেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। আমি যেমন 'সাপ' 'সাপ' বলে খুঁজে বেড়াচ্ছি তাঁরও তেমনি অবস্থা। কার কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন যে, দুটো সাপ যদি মৈথুনাবদ্ধ হয়, সে দৃশ্য দেখবার সুযোগ হলে তা অসীম সৌভাগ্যের কারণ। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁর নিজের বাড়িতেই দুটো মৈথুনাবদ্ধ সাপ তিনি দেখতে পান। লোকপ্রবাদ মৈথুনাবদ্ধ সাপের নিচে যদি নতুন কাপড় বিছিয়ে দেওয়া যায় এবং সেই সর্পযুগল যদি তার উপর উঠে রতিক্রিয়া করে এবং

সেই কাপড় যদি কেউ সংগ্রহ করে রাখে তবে তার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই। ভদ্রলোক বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সেই কাজ করেছেন, অর্থাৎ নতুন কাপড় পেতে দিয়ে তার উপর সর্পযুগলকে রতিক্রিয়া করিয়েছেন। সেই নতুন কাপড় এনে ঠাকুরের আসনে তুলে রেখেছেন। এখন তাঁর প্রশ্ন, এতে তাঁর ভাগ্যের কোন হেরফের ঘটবে কিনা। এ-জন্য তিনিও আমারই মত সর্পতান্ত্রিকের খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন।

তাঁর ইচ্ছা, কোন সর্পতান্ত্রিকের সন্ধান পেলে তার সঙ্গে তিনি দেখা করেন। ভদ্রলোকের আগ্রহ দেখে আমার সাহস হল। বুঝলাম, সর্পের অধ্যাত্মতা সম্পর্কে আমারই মত অনেকেই বিশ্বাস করেন। সুতরাং এ গ্রন্থ রচনাতে সাহস করে এগিয়ে গিয়ে খুব যে 'ভুল করেছি তা নয়। আমারই মত কৌতূহল প্রকাশ করার লোকও আছে।

আমরা সব সময় 'আমি করি' 'আমি করি' বলি বটে, আসলে কিন্তু অব্যক্ত একটা শক্তিই আমাদের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। আমাদের হাতের কলম তাঁর ইচ্ছাতেই চলে, উপাদানও তিনিই সংগ্রহ করে দেন। সাপ সাপ বলে যখন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন হঠাৎই একদিন সাপ সম্পর্কে কৌতূহল আছে এমন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল।

টালিগঞ্জ ভবানী সিনেমার উল্টোদিকে দেশপ্রাণ শাসমল রোডে ভদ্রলোকের একটি ওষুধের দোকান আছে। নাম দেবতোষ দত্ত। থাকেন ৪৯-এ বক্তিয়ার শা রোড, টালিগঞ্জে। আমার 'সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে' গ্রন্থের নাম না শুনেই, এবং আমিই যে সেই গ্রন্থের লেখক একথা না জেনেই আমাকে সাপ সম্পর্কে নানা গল্প বলতে লাগলেন। সাপ যে একটা অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রতীক এ বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এমনকি সাপের নানা অলৌকিক ক্ষমতা আমাকে প্রত্যক্ষ করাবার জন্য আমাকে কয়েকটি জায়গায় তিনি নিয়ে যাবেন বলেও প্রস্তাব দিলেন। অদ্যাবধি তা প্রত্যক্ষ করতে যাবার সময় আমার হয়নি। এ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য আছে এটা অনুমান করতে পেরে একদিন তিনি একটি পুস্তিকা হাতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন

আমার বাসায়। পুস্তিকাটির নাম 'শ্রীশ্রীমহাদেবী মায়ের পত্র-যোগবাণী'। লেখক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র কাব্যতীর্থ। গ্রন্থটিতে সাপের কিছু রহস্যময় কাহিনী আছে। যদিও আমার বক্তব্য লৌকিক কোন সাপ নয়, তবু অতীন্দ্রিয় সর্পরহস্যের জটিলতা ভেদ করতে পারিনি বলে পার্থিব সর্পরহস্যও আমার কাছে অবজ্ঞার কোন ব্যাপার নয়। কে বলতে পারে কোথায় কোন্ সূত্রে, কোন্ অলৌকিক ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাবে কেমন করে? সুতরাং পুস্তিকাটি নিলাম।

আশ্চর্য এক সর্পযজ্ঞের কাহিনী আছে পুস্তিকাটিতে। মহাভারতে আছে রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের কাহিনী। এর পর নতুন কোন সর্পযজ্ঞ হয়েছিল বলে জানা নেই। এখন পড়ছি এ যজ্ঞের কথা। এ যজ্ঞ করেছিলেন শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতা মহাদেবী। স্থান অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত আদমপুর অঞ্চলের শিববাড়ি। লেখক তিন সত্য করে বলেছেন যে, এ কাহিনী সংশয়াতীত। শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতা মহাদেবীর প্রথম ভক্তশিষ্য ব্রহ্মচারী বিষ্ণানন্দ। তাঁর মাসতুতো ভাইয়ের ছিল সর্পদংশন যোগ। জাতকের পিতামাতা এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যোগেশ্বরী মাতা মহাদেবীর শরণাপন্ন হলেন দীনভাবে। তাঁদের করুণ আবেদনে শেষপর্যন্ত যোগেশ্বরী মাতা মহাদেবীও সাড়া দিলেন। তিনি সাধনার দ্বারা পেয়েছিলেন এমন অলৌকিক এক ক্ষমতা যে, যে দেবতাকেই তিনি ধ্যান করবেন সেই দেবতাই তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হতে বাধ্য হবেন স্মরণ মাত্র। শ্রীশ্রীমা সেইজন্য দেবী ত্রৈলোক্যতারিণীর মন্দিরে ঢুকে নাগজননী মনসাদেবীর ধ্যান করলেন। ধ্যানে দেবী মনসা তাঁকে এসে দেখা দিলেন। দেবীর কাছে শ্রীশ্রীমা সর্প দংশন যোগ প্রতিকারের জন্য মা মনসার কাছে অনুমতি চাইলেন সর্পযজ্ঞ করার। মনসাও তাঁকে অনুমতি দিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন আয়োজন করতে বললেন সর্পযজ্ঞের। এজন্য প্রয়োজন একটি তামার তৈরি সাপ, বেদজ্ঞ পঞ্চ পণ্ডিত, যাঁদের মধ্যে থাকবেন একজন একজন করে সামবেদীয়, যজুর্বেদীয়, ঋক্‌বেদীয় ও অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণ। লাগবে পাঁচ সের ঘি

ও সোয়া মণ তিলের উপকরণ। তা ছাড়া করতে হবে বাবা বিশ্বনাথ, মনসাদেবী, জরৎকারু মুনি, আস্তিক মুনি, নাগরাজ বাসুকি ও অনন্ত-নাগের পূজার ব্যবস্থা। সর্পপূজক আনতে হবে, এবং তন্ত্রধারক ও চর্বকাদি সহযোগে ষোড়শোপচারে করতে হবে পূজার ব্যবস্থা। জাতকের পিতা মাতা সে ভাবেই সব আয়োজন করলেন। যজ্ঞের দিনও নির্দিষ্ট হল পঞ্জিকা দেখে।

যজ্ঞের দিন নির্দিষ্ট হল, কিন্তু যজ্ঞবেদী তৈরি হতেই ঘটল আশ্চর্য এক ঘটনা। কোথা থেকে বিশাল এক ফণাধারী সাপ এসে জুটল বিশ্বনাথের মন্দিরে। এসেই আরম্ভ করল তর্জন গর্জন। ব্রাহ্মণেরা ভয় পেলেন। কিন্তু যজ্ঞ বন্ধ করলে চলবে না। তাই পরের দিনই শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি নিয়ে আরম্ভ হল যজ্ঞ। তামার তৈরি সাপ, রুপার আসন, মধুপর্ক, বস্ত্র, নৈবেদ্য সব সাজানো হল থরে থরে। আসনের পাশে একটি নতুন আসন পেতে তার আগে সাজানো হল পাঁচ সের দুধ, মধু, দই, ঘি ও পাকা কলার নৈবেদ্য। হাজার হাজার লোক শিববাড়িতে সেই সর্পযজ্ঞ দেখার জন্য ছুটে এল। শ্রীশ্রীমা ব্রাহ্মণদের বললেন—'আগন্তুক সাপ যদি আসনের কাছে ছুটে আসে তাঁকে পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি করবেন।' তারপরই আরম্ভ হল যজ্ঞ। ব্রাহ্মণেরা পঞ্চবেদ মন্ত্র গান করে কাঠের হাতায় ঘি নিয়ে বেদী প্রদক্ষিণ করে 'স্বাহা ইদমগ্নয়ে' বলে যজ্ঞাগ্নিতে দিতে লাগলেন ঘৃতাহুতি। চলতে লাগল অনুসঙ্গ আরও সব কাজ। আকুল দর্শকরা তাকিয়ে আছে অলৌকিক ঘটনা দেখার জন্য। যজ্ঞ প্রায় শেষ হয়, তবুও তেমন কিছু ঘটছে না। দিনও প্রায় শেষ। সূর্য পাটে বসে। এমন সময় দেখা গেল সাপ আসছে চারদিক থেকে। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ সাপ দেখেই চিৎকার করে উঠছে, 'সাপ, সাপ।' অমনি সাপ যাচ্ছে থমকে। যজ্ঞস্থলে আসতে পারছে না। কিন্তু তবু কখন এরই মধ্যে একটি সাপ এসে উপস্থিত হল যজ্ঞক্ষেত্রে। প্রধান হোতা যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দেবার জন্য সংগ্রহ করছেন নতুন কাপড়, স্বর্ণকণিকা, নারকেল, তাম্বুল আর সুপারী। এমন সময় দেখা গেল সেই সাপটি

দুধের বাটিতে এসে দুধ খাচ্ছে মনের সুখে। হোতৃ শ্রীশ্রীমাকে জানালেন সাপের কথা। মা এসে করজোড়ে বেদীতলে দাঁড়ালেন সাপের সামনে। দুধ পান করে পরিতৃপ্ত সাপ শ্রীশ্রীমায়ের মাথা পর্যন্ত ফণা তুলে তালে তালে দুলতে লাগল। মা বললেন, বাবা আপনি নিজের আসনে বিশ্রাম নিন। ব্রাহ্মণদের ভয় দেখানো বন্ধ করুন। আদিষ্ট যা যা কাজ আছে, তা করতে দিন। কাজের শেষে এই মন্দিরে বিজয়া করবেন। আশ্চর্য ঘটনা, সাপও যেন মানুষের মত কথা বুঝতে পারে। সেই সাপটিও নতুন কাপড়ে তৈরি নিজের আসনে গিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে বসল। পূর্ণাহুতি দিয়ে শান্তিবারি ছিটিয়ে পুরোহিত সর্পযজ্ঞ শেষ করলেন। পূজার নৈবেদ্য রেখে দেওয়া হল নাগতলার একটি নির্জন গাছের নিচে সাপেদের জন্য। আগন্তুক সাপটি যে আসনে কুণ্ডলি পাকিয়ে বসেছিল সেই আসনের নতুন কাপড়ে নীলদংশনে বিষোদগার করে জাতককে চিরকালের জন্য সর্প দংশনের হাত থেকে অব্যাহতি দিল। সেই উগ্রে ফেলা বিষের কাপড় নিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হল। সে জাতক অদ্যাবধি জীবিত আছে।

শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে এ পুস্তিকাটিতে আরও নানা গল্প আছে। শ্রীশ্রীমার বাড়ির এক শিশুকন্যা ঘরভর্তি লোকের মধ্যে যখন ঘুমিয়ে আছে, দেখা গেল তার বিছানার পাশে একটি বিষাক্ত সাপও শুয়ে আছে। ভয়ে সকলে কাঠ। শ্রীশ্রীমা সেকথা জানতে পেরে একটি ধুনুচি হাতে সেখানে এসে সাপটির পাশে দাঁড়ালেন। ধুনুচির গন্ধে সাপটি জেগে উঠল। জেগে উঠেই ফণা তুলে মায়ের ধুনুচি পর্যন্ত এগিয়ে এল। জিহ্বা বের করে ধুনার গন্ধ নিতে লাগল। ভয়ে সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে আছে। কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ছেলেরা সাপটাকে মারবার জন্য লাঠি-সোটা খুঁজতে থাকল। শ্রীশ্রীমা তাদের ভয় পেতে বারণ করে সাপটিকে লক্ষ্য করে বললেন, বাবা, আপনি মহানাগ উদয়ন। বিশ্বনাথের মাথায় থাকেন। ইচ্ছে মত ছোট বড় হতে পারেন। নিজেকে নানা রঙে রঙিন করতে পারেন। আপনাকে

দেখার ভারি ইচ্ছে হয়েছিল। আপনি সেইজন্য কষ্ট করে এসেছেন। বিশ্বনাথের অঙ্গভূষণ আপনি এবার তাঁর কাছেই চলে যান। শ্রীশ্রীমা সাপকে প্রণাম করলেন ধুনুচি কপালে ঠেকিয়ে। সাপটি মায়ের মাথা পর্যন্ত ফণা তুলে জিহ্বা দিয়ে তাঁর কপাল ছুঁলো। তারপর ছোট হতে হতে সাধারণ একটা সাপ হয়ে এঁকে বেঁকে শ্রীশ্রীমাকে প্রদক্ষিণ করল। প্রদক্ষিণ করেই চলে গেল ঘরের বাইরে। ইতিমধ্যে পাড়ার ছেলেরা সেই ভয়ঙ্কর সাপের কথা শুনে লাঠি-সোটা নিয়ে এসে হাজির। তারা মুখোমুখি এসে পড়তেই সেই সাপটি হঠাৎ এত বড় হয়ে গেল যে বলার নয়। তারপর বিশাল এক ফণা তুলে গর্জন করে ফুঁসতে লাগল। তা দেখে সাপ মারার জন্য যারা এসেছিল তাঁরা সব ভয়ে কাঠ। সাপ মারবে দূরস্থান—তারা চিৎকার করতে লাগল শ্রীশ্রীমায়ের নাম করে। মা তখন তৈরি হচ্ছিলেন নিত্য দিনের সর্পবলি দেওয়ার জন্য। চিৎকার শুনে সেখানে গিয়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়ালেন। কমণ্ডলু থেকে জল ও সাজি থেকে ফুল নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন সাপের মাথায়। বললেন, 'বাবা বিশ্বনাথ প্রসন্ন হোন।' সঙ্গে সঙ্গে সেই মহানাগও শান্ত হয়ে গেল আশ্চর্যভাবে। তারপর মায়ের দেওয়া সর্পবলি গ্রহণ করে সাধারণ একটা সাপের মত এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেল বাইরে। দেখতে দেখতে মহানাগ হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

শ্রীশ্রীমা ও সর্প সম্পর্কে আরও সব অলৌকিক ঘটনার বিবরণ আছে পুঁস্তিকাটিতে। পড়লে পড়ে মনে হয় নিতান্তই গল্পকথা। বিশ্বাস করাই যেন দায়। কিন্তু পৃথিবীতে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যে ব্যবধানের রেখা টানা দুরূহ। আজ বিজ্ঞানের যুগে আমরা মন্ত্র-শক্তিতে বিশ্বাস করি কয়জনে? অথচ মন্ত্রের জোরে বাটি চালান. ঘটি চালান দিতে পারে এমন লোকের সন্ধান আপনি ঘরের কাছেই পেতে পারেন। মন্ত্রের জোরে পিঠে থালা চাপিয়ে রোগের চিকিৎসা করছেন এমন লোক আমি নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, 'আমি কি এ-ধরনের সাপেরই সন্ধান করেছিলাম?' ছোটবেলায় আমার গ্রামের বটগাছের নিচে সেই যে তান্ত্রিকের কণ্ঠে শুনেছিলাম: সাপকে

ভয় কিরে? সাপই যে সব রে!' এই কি সেই সাপ! তা যদি হয়, তাহলে হিমালয়ের আঙ্গিনায় তুঙ্গনাথ পথের ধারে সেই যে সর্প-তান্ত্রিকের সন্ধান পেয়েছিলাম তিনি সাপের রহস্য ভেদ করতে বিশ্ব সৃষ্টির মূলেই বা আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কেন। তাঁর সেই অপার্থিব সাপের কাহিনী পার্থিব সাপের চাইতেও সেদিন আমার মধ্যে বেশি আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। আজও তার সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার অনুভূতিকে মেলে দিলে আমি যেন নিঃসীম মহাকাশের মধ্যে অনন্ত অসীমের সামান্য স্বাদ পাই। বুকের মধ্যে কেন যেন গুরগুর্ করে ওঠে। তখন মনে হয় দেহের অভ্যন্তরেই কোথাও যেন সেই সাপ আছে। 'আত্মানং বিদ্ধি' বলে উপনিষৎবেত্তারা সেই সাপের সন্ধানই করতে বলেছিলেন। সত্যি, সাপ এক বিরাট রহস্য।

দুই

সর্পরহস্য, সত্যি আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে বোধহয়। যেখানে যাই, যে কাজই করি সাপ যেন গলার কাঁটার মত বুকের মধ্যে ফুটে থাকে। যারা শোনে তাদের মধ্যে কেউ বলে, তান্ত্রিকের পাল্লায় পড়েছিলে মন্ত্র করেছে তোমাকে, তাই আজেবাজে চিন্তা মন থেকে যাচ্ছে না। এইজন্যই পারতপক্ষে তান্ত্রিকদের এড়িয়ে চলতে হয়। কলেজ স্ট্রীটে প্রুফ দেখেন, সোদপুরে থাকেন, কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন, বিভিন্ন শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান আছে এমন একটি তরুণকে আমার অন্যতম এক প্রকাশক তাঁর প্রুফ দেখতে দিয়েছেন। তিনি একদিন আমাকে ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতার কথা বললেন। তন্ত্রমন্ত্রে তার বড় আকর্ষণ ছিল। তান্ত্রিক খুঁজতে গিয়ে এক বিকট তান্ত্রিকের পাল্লায় পড়েছেন তিনি, যে তান্ত্রিক তাঁকে অভিচার ক্রিয়া করে বশ করতে চাচ্ছে। তাঁর উদ্দেশ্য তরুণটি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁকে লিখে দিক। বাবার সম্পত্তির সে-ই একমাত্র উত্তরাধিকারী। তরুণটি তাতে রাজী নন। কিন্তু কি

অভিচার ক্রিয়া করেছেন তান্ত্রিক কে জানে, তিনি অহরহ কানে তাঁর কণ্ঠ শুনতে পান : 'সমস্ত সম্পত্তি লিখে দে।' রাতের ঘুম গেছে, দিনেও নির্জনে থাকলেই সেই কণ্ঠ কানে বেজে ওঠে। তরুণটি প্রায় অর্ধ উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন, তাঁর স্মৃতিশক্তি দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অনেকের ধারণা, হিমালয়ের আঙিনায় দুধচটিতে কিংবা আমার গ্রামের বটগাছের নিচে সেই ধরনের কোন তান্ত্রিকের পাল্লায় আমি পড়েছিলাম—তাই সাপের স্মৃতি অহরহ আমাকে খোঁচা দিচ্ছে। কেউ বললেন, বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম করে এর একটা বিহিত কর, শোধন কর, সাপের ভূত ঘাড় থেকে নামবে। আমার এক পরিহাসপ্রিয় আত্মীয় বললেন—'একটা বিষাক্ত সাপ এনে দিই। কাছে গিয়ে দেখ সাপের মধ্যে পরমার্থ পাওয়া যায় কি না। পাবে, সাধুসন্তের সমাধিতে যে সংবিৎহীনতা আছে তাই পাবে। অনন্ত নিদ্রা চেপে ধরবে। যেভাবে সাপ তোমাকে পাগল করে তুলেছে, সাপের কামড়েই কবে না তুমি পটল তোল। শোন, বাড়িতে একদিন গরুড় পূজা কর। গরুড় হল সাপের প্রতিষেধক, ভূত ঘাড় থেকে নামবে।'

অনবরত আমার মুখে সাপের কথা শুনতে শুনতে আমার ছোট কাকা একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন, বাড়িতে ওঝা নিয়ে এস, ঝাড়-ফুঁকের প্রয়োজন।

কেউবা দিচ্ছেন উপদেশ, কেউবা অপদেশ ; ঠাট্টা বিদ্রূপের অন্ত নেই। অসুখ হলে আনাড়ীর পরামর্শের অন্ত থাকে না। অনাবশ্যক বহু উপদেশ-অপদেশ পেতে থাকলাম। কিন্তু ঠাট্টা বিদ্রূপ উপদেশ-অপদেশেও যে আমার মন থেকে সাপের ভূত নামল তা নয়। সর্পরহস্য যেন সাপেরই মত এঁকে বেঁকে অনবরত আমার মধ্য দিয়ে চলতে থাকল।

আমার এক বিরাট পণ্ডিত অধ্যাপকবন্ধু একদিন 'সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে' প্রথম খণ্ড পড়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এসে প্রথম কথাই বললেন, সাহিত্যে এ আবার কি বুজরুকি আনতে চাও হে

পু। অবধূতের মত স্টানট তৈরি করতে চাও নাকি ? বাংলা সাহিত্যে অপসংস্কৃতি আর কত আনবে ?

আমি বললাম, একে তুমি অপসংস্কৃতি বলতে চাও ?

—আলবৎ।

—তাহলে সাপ নিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী একসময় এমন আন্দোলন হয়েছিল কেন ?

অধ্যাপক বন্ধুটি বললেন, ভয়ে।

—ভয়ে !

—হ্যাঁ।

—কি রকম ?

—যেভাবে সৃষ্টি রহস্যের কোন কূল-কিনারা করতে না পেরে মানুষ একদিন প্রাকৃতিক ঘটনার অন্তরালে নানা দেবদেবীর কল্পনা করেছিল, সেইভাবেই সাপেরও পূজা এসেছিল। সারা পৃথিবীই এক সময় ছিল অরণ্যে আবৃত। সরীসৃপ শ্রেণীর উৎপাতের অন্ত ছিল না। সাপের কামড়ে বহু লোক মারা যেত। কি করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় বুঝতে না পেরে মানুষ সাপের পুজো করতে আরম্ভ করেছিল।

আমি বললাম, অনেক ওঝা মন্ত্রবলে বিষাক্ত সর্পদংশন থেকে লোককে বাঁচিয়েছেন, শোননি ?

অধ্যাপক বন্ধু বললেন, যে-সব ক্ষেত্রে বাঁচিয়েছেন, সে-সব ক্ষেত্রে সর্প বিষাক্ত ছিল না এ-কথা জেনে রাখবে।

—কড়ি চালান দিয়ে যে-সাপ দংশন করেছে তাকে ধরে আনা হয়েছে, এ কাহিনী শুনেছো তো ?

—হ্যাঁ। শুনেছি, দেখিনি। প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করে দেখবে সবাই বলবে শুনেছি, দেখিনি। তুমি দেখেছ ?

—না।

—সুতরাং ও-সব

আমি বললাম, কিন্তু আমার সাপটা তো পার্থিব সাপ নয়

অধ্যাপক বন্ধুটি বললেন, অপার্থিব সাপ আছে বলে তুমি যা মনে করছ তাও সত্য নয়। দেহের মধ্যে কোথাও সাপ নেই, বিজ্ঞান চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখেছে। দেহের মধ্যে সর্পাকৃতি কিছু ক্রিমি আছে, মাঝে মাঝে অনেকের মধ্যে সেগুলি উথাল দিয়ে ওঠে। তখন রুগীর বিকার হয়। যারা সর্প জাগ্রত হয়েছে বলে সমাধির ভান করে তারা আসলে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে ক্রিমি বিকারের জন্য।

বললাম, বুঝতে পারছি তুমি বিদ্রূপ করছ। কিন্তু মনে রেখ ব্যাপারটা কিন্তু সবটাই বিদ্রূপের নয়। তাহলে স্যার জন উডরফের মত পণ্ডিত ব্যক্তি এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। [1]ইদানীংকালে তন্ত্র নিয়ে অধিবস্তুবাদী লেখকেরা ইউরোপেও মাথা ঘামিয়েছেন। অধিবস্তুবাদী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ আন্দ্রে ব্রেতোঁ তাঁর স্যুররিয়ালিজমের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সেই বিরাটাকৃতি গ্রন্থের শেষপর্যায়ে ভূয়সী•প্রশংসা করেছেন শুধুমাত্র তন্ত্রের। বলেছেন, মুক্তি আছে ভারতে ও তিব্বতে।

বন্ধুটি বললেন, সার্থক কবি হতে না পেরে ব্রেতোঁর মাথা খারাপ হয়েছিল, যা না তাই বলেছেন।

বুঝলাম বন্ধুটি ব্রেতোঁর 'হিস্টরি অব স্যুররিয়ালিজম' গ্রন্থটি পড়েননি। না পড়ে পাণ্ডিত্যের অভিনয় করা এ-কালের একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে তোমার অভিমত কি ?

তিনি বললেন, বিজ্ঞানসম্মত নয়।

—উপনিষৎও কি বিজ্ঞানসম্মত নয় ?

—না।

—উপনিষৎ সম্পর্কে আমি যে সামান্য কিছু আলোচনা করেছি তুমি পড়নি ?

—পড়েছি।

বুঝলাম, বন্ধুটি পড়েননি, না পড়েই বলছেন। তাঁকে শুধু মাত্র একটি পুরাণ-কাহিনীর কথা বললাম, জান তো আমাদের পুরাণে আছে সৃষ্টির আগে মহাম্বুধিতে বিষ্ণু অনন্তনাগ শয্যায় শায়িত ছিলেন ?

বন্ধুটি বললেন, সব গ্যাজা।

—কিন্তু বিজ্ঞান বলছে, মহা বিশ্বের যেখানে ঘনবস্তু নেই সেখানে পুঞ্জ পুঞ্জ হাইড্রোজেন কণা জমছে।

—তাতে কি ?

—এ থেকে বিষ্ণু, অনন্তনাগ ও মহাশূন্যের একটা তুলনা খুঁজে পেতে পার না !

—এমন ধরনের অবান্তর চেষ্টা করে লাভ কি ?

বুঝলাম, বন্ধুটি অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্স পড়েননি। সুতরাং এসব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে তর্কে আর অগ্রসর হতে ইচ্ছে হল না। শুধু তাঁকে বললাম, তাহলে সাপের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তোমার মতে কি ?

—সাপের কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নেই। তবে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আছে, সেটা পড়। তোমার কাঁধ থেকে সাপের ভূত নামবে।

বললাম, সাপের ইতিহাস ! সে তো মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে আছে বলে শুনেছি।

বন্ধুটি বললেন, শুনেছ, কিন্তু পড়ে দেখনি। একবার পড়ে দেখ, তাহলেই বুঝবে। সাপের একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে, তার বেশী কিছু নেই।

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে যে সাপের কথা আছে সে হল পার্থিব সাপ। আমার সর্প-চিন্তার সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। তবে পার্থিব সাপেরও যে সব অলৌকিক কাহিনী শুনেছি, তাতে লৌকিক অলৌকিক সাপে ভেদ করাও কষ্টকর। মঙ্গলকাব্যে সর্প সম্পর্কে কি কাহিনী লেখা আছে আমি পড়িনি। না পড়ে মন্তব্য করার স্বভাব আমার নেই। না পড়ে কোন গ্রন্থের মূল্য আমি বিচারও করি না। যাকে অবজ্ঞা করে এগিয়ে যাচ্ছি তার মধ্যেই যে আমার অভীপ্সিত বস্তুটি নেই, তা কে বলতে পারে ! সুতরাং বন্ধুটিকে জানালাম যে, মঙ্গলকাব্যের সর্প সংক্রান্ত অধ্যায়টি আমি পড়ে দেখব। না দেখে এ বিষয়ে আর কোন কথা বলছি না।

একদিন গ্রন্থাগার থেকে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'মঙ্গলকাব্যের

ইতিহাস' গ্রন্থটি নিয়ে এলাম। গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণের ২৩৭ পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষে সর্প পূজার উৎপত্তি, বাংলার মনসা পূজা, মনসামঙ্গল কাব্য ও মনসামঙ্গলের কবিদের উপর বিস্তৃত আলোচনা আছে। আমার বন্ধুটির অভিমত এবং ডঃ ভট্টাচার্যের বিশ্বাস এই যে, সর্পপূজা অনার্য। অরণ্যসঙ্কুল ভারতবর্ষে সাপের উৎপাত ছিল। সেই সর্পভীতি থেকেই সর্পপূজার উৎপত্তি। তবে শুধুমাত্র যে ভারতবর্ষেই এই সর্পপূজা ছিল তা নয়। ভারতের বাইরেও ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিত জে. ফার্গুসনের মতে, সর্প পূজার উৎপত্তি ভারতবর্ষের বাইরে, তুরাণী জাতির মধ্যে। এরাই ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম পথে এদেশে প্রবেশ করে সপপূজার প্রচলন করেছিলেন। আর্যরা ভারতে ঢুকে তাদের কাছ থেকেই সর্পপূজা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। ভিন্ন মতাবলম্বীদের ধারণা, সর্প হল নাগ। ভারতীয় নাগ জাতি তাদের অভিজ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করত সর্পপ্রতীক। কোন নাগ-দেবতাই সর্প হিসেবে পুজো পেয়ে আসছেন। কারো মতে, অর্ধনর ও অর্ধনাগ জাতীয় এক ধরনের জীব ছিল। তাদেরই দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হত একসময়। কারো মতে জলদেবতাকেই ভারতে সর্পদেবতা হিসেবে পূজা করা হত। তবে ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্প তার নিজস্ব আকৃতিতে নাগ পূজার আগেই পুজো পেত। খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে ভারতের উত্তর অঞ্চলে ছিল নাগপূজা প্রচলিত। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে ভারতে আগত গ্রীকদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, সর্পকে ভারতীয়েরা পবিত্র বলে জ্ঞান করত। গিরিগুহায় সর্পকে আবদ্ধ রেখে ভক্তিভরে তার পূজা দিত। জীবিত সর্পের পূজা এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানেই প্রচলিত। দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে এখনও জীবিত সর্পকে মন্দিরে রেখে ভক্তিভরে তার পুজো করা হয়। বাস্তুসর্প এখনও ভারতবর্ষের বিরাট অঞ্চলে গৃহস্থদের কাছ থেকে পূজা লাভ করে।

ভারতবর্ষের প্রোটো-অস্ট্রোল্যয়েড জাতির মধ্যে সর্প পূজার তেমন চলন নেই। তবে মঙ্গল্যয়েড জাতির মধ্যে এখনও কিছু কিছু আছে। নিগ্রিটো জাতির ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া বর্তমানে দুষ্কর! তবে

দ্রাবিড় জাতির মধ্যে এখনও এর বহুল প্রচলন আছে। আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদে, সর্পের কথা উল্লেখ থাকলেও সর্প পূজার কথা তেমন নেই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দমনযামায়ন ঋষি দৃষ্ট একটি সূক্তে আছে 'সর্প' শব্দের উল্লেখ, যেমন, 'যৎ তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ'। এ ছাড়া ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮৯নং সূক্তটিও সর্পরাজ্ঞী সূক্ত। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্র, সূর্য-রশ্মির অন্তর্নিহিত স্পন্দনপ্রকৃতিকে বলেছেন, 'সসর্পরীবাক' 'সূর্য-দুহিতা।' এ ছাড়া আরও নানা স্থানে আছে সর্পের উল্লেখ। ঋগ্বেদে সর্পের তেমন উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে, যেমন যজুঃ ও অথর্ববেদে পাওয়া যায় সর্পের বিস্তৃততর উল্লেখ। তবে সর্পপূজা বলতে যা বোঝায় তেমন কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই এখানে। কিন্তু অথর্ববেদে আছে সর্প সম্পর্কিত কতকগুলি মন্ত্রের উল্লেখ। আর্যদের মধ্যে সর্পপূজার সংক্রমণ হয় দ্রাবিড়দের সঙ্গে যোগাযোগ হবার পর থেকে।

যদিও সর্পপূজা আমরা লাভ করেছি দ্রাবিড়দের কাছ থেকেই তবুও মহাভারতে সর্পকে বলা হয়েছে আর্যবংশোদ্ভূত সন্তান বলে। তাদের পিতার নাম কশ্যপ, মাতার নাম কদ্রু। এ নিয়ে মহাভারতে আছে বেশ একটা গল্পেরও অবতারণা। যেমন, মহামুনি কশ্যপের দুই পত্নী, কদ্রু ও বিনতা। কদ্রুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বাসুকি প্রমুখ নাগ এবং বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণ। বাসুকি হল নাগদের অধিপতি। তার ভগিনীর নাম জরৎকারু।

যাযাবর ব্রতাবলম্বী এক ঋষিবংশে জন্মগ্রহণ করেন জরৎকারু নামে এক ঋষি। সংসারের প্রতি তিনি বীতস্পৃহ। দেশ দেশান্তর ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি এলেন এমন এক জায়গায় যেখানে তাঁর পিতৃপুরুষেরা করছিলেন এক অদ্ভুত অবস্থায় বিরাজ। তাঁরা বৃক্ষশাখায় সবাই ছিলেন অধোমুখ হয়ে। জরৎকারু মুনি তাঁদের এই দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তাঁরা জানালেন, যে, জরৎকারু দারপরিগ্রহ করে সংসারধর্ম পালন করছেন না এইজন্যই তাঁদের এই দুরবস্থা। তাঁদের অনুরোধে জরৎকারু মুনি শেষপর্যন্ত রাজী হলেন দারপরিগ্রহে,

তবে বিশেষ একটি শর্তে। শর্ত এই, উপযাচক হয়ে কারও কন্যার পাণি প্রার্থনা করবেন না তিনি। কন্যার নামও হওয়া চাই তাঁর নিজের নামেরই অনুরূপ। পত্নীর ভরণপোষণের দায়িত্বও তিনি নেবেন না। যেদিন ইচ্ছে সেদিনই যাবেন পত্নীকে পরিত্যাগ করে।

ইতিমধ্যে অর্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয় সর্পযজ্ঞের আয়োজন করেছেন সর্পকুল নিধন করতে। কারণ পিতা পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়েছিল সর্পদংশনে। যজ্ঞের কথা শুনে পাতালে নাগকুলের মধ্যে হল ত্রাস। কিন্তু তারা আশ্বস্ত হল এই জেনে যে, বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর গর্ভে কোন মহাতপা মুনির ঔরসে জন্মগ্রহণ করবেন এক পুত্র। সেই পুত্রই রক্ষা করবেন সর্পকুলকে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ ব্যর্থ করে।

এমন সময় একদিন একা অরণ্যে দাঁড়িয়ে জরৎকারু মুনি ঘোষণা করলেন—তাঁর বিবাহের সংকল্পের কথা। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন তাঁর শর্তগুলিও। সে-কথা শুনতে পেলেন নাগরাজ বাসুকি। তিনি মুনির শর্ত অনুসারেই নিজের ভগ্নীকে তুলে দিতে রাজী হলেন জরৎকারুর হাতে। সুতরাং মুনির সঙ্গে বিবাহ হল বাসুকি-ভগ্নীর।

একদিন সামান্য অজুহাতে জরৎকারু মুনি পরিত্যাগ করলেন পত্নীকে, কারণ, পত্নী তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করেছিলেন অসময়ে। তিনি চলে গেলেন বটে, তবে পত্নীর গর্ভে রইল তাঁর সন্তান। যথা সময়ে সেই সন্তান হল ভূমিষ্ঠ। তাঁর নাম আস্তিক। আস্তিক অল্প বয়সেই পারঙ্গম হয়ে উঠলেন সর্ব শাস্ত্রে। তিনিই শেষপর্যন্ত তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও কৌশলে জনমেজয়ের সর্পসত্র নষ্ট করে রক্ষা করেন নাগকুলকে।

এ-সব গল্পকথাকে মনে হয় অবিশ্বাস্য। আর এ গল্পের সর্পকে মনে হয় না যথার্থ সাপ বলে। নাগ আর সাপের মধ্যে সামান্য একটু পার্থক্য আছে বলেই মনে হয়। নাগ হল এক ধরনের মনুষ্য জাতি, যারা **Totem** বা অভিজ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করত সর্প। প্রাচীনকালে এধরনের **Totem** বা অভিজ্ঞান ব্যবহারের আছে বহু নজির। মিশরে এ নজির ভূরি ভূরি। সুতরাং আমি যে সর্পের সন্ধানে খুঁজে বেড়াচ্ছি এ গল্পের মধ্যে সে সর্পের কোন ইঙ্গিত নেই।

সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী যথার্থ কোন দেবীর চিত্র বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে মহাভারত বা বৌদ্ধ সাহিত্যের কাল পর্যন্ত কোথাও নেই। বৈদিক সাহিত্যের 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' এক জায়গায় আছে সর্পরাজ্ঞী বলে একটি শব্দ। কিন্তু এ 'সর্পরাজ্ঞী' শব্দ সর্পরাণী হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। সর্পরাজ্ঞী শব্দ এখানে পৃথিবী হিসেবে উল্লেখিত। কোন স্ত্রী দেবতাকে সর্বোত্তম প্রাধান্য দিয়ে আর্যরা কখনও বরণ করেন নি অনার্য চিন্তায়। মায়ের প্রাধান্য ছিল অনার্য চিন্তার মধ্যেই বেশী। মহাভারতের আর্য-যুগে বাসুকিকে দেবতা ভেবে তাঁর পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল বটে, কিন্তু কোন স্ত্রীই আর্যদেবীর মর্যাদা পাননি তখনও। অথচ আজ যে ভারতবর্ষে শক্তিরূপে স্ত্রী-দেবতার পূজার ব্যবস্থা, সর্প তাতে অপরিহার্য বিষয়। দুর্গা প্রতিমার হাতে রয়েছে সাপ। কালীর সঙ্গেও সাপের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শেষপর্যন্ত তন্ত্রে দেখি সর্পই প্রধানা শক্তিদেবী হিসেবে আবির্ভূতা। এবং এই তন্ত্রকে আর্যরাও নিয়েছেন গ্রহণ করে। এই সর্প তবে কোন্ সর্প? কি করেই বা তাঁর আবির্ভাব?

স্ত্রী রূপে সপ দেবতার প্রাধান্য ছিল অনার্য প্রভাবিত অঞ্চলেই, বাংলাদেশে ও দাক্ষিণাত্যে। বাংলাদেশে সর্পদেবী শেষপর্যন্ত তুঙ্গে উঠেছিলেন যথেষ্ট সোরগোল তুলেই। তাহলে বাংলাদেশের মনসা পূজার মধ্যেই কি পাওয়া যেতে পারে সাপের সন্ধান? এবং বাংলাদেশে সর্পিণীর এই মর্যাদা যথার্থই কি একান্তভাবে বঙ্গদেশীয় না অন্য কোথা থেকে আগত?

বৃক্ষের সঙ্গে সাপের একটা নিবিড় সম্পর্ক চিরকাল। দাক্ষিণাত্যে অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে আছে সাপের সম্পর্ক। সেইজন্য অশ্বত্থ গাছের নিচে সেখানে উপহার দেওয়া হয় প্রস্তর নির্মিত নাগমূর্তি। অপুত্রক রমণীরা পুত্র মানসে করেন এই নাগপূজা। নাগপূজা করে তাঁরা ১০৮ বার অশ্বত্থ বৃক্ষ পরিক্রমা করেন। কিন্তু এ থেকে পাওয়া যায় না সাপের অধ্যাত্ম চরিত্রের তেমন কোন প্রমাণ। বরং একে উর্বরতা শক্তির পরিচায়ক বলেই মনে হয়। ইংরেজীতে যাকে বলে **fertility**

cult। বাংলাদেশেও যে অশ্বত্থ গাছের নিচে সর্পপূজার রীতি প্রচলিত ছিল না একদিন তা নয়। ছোটবেলায় আমার গ্রামের মেয়েদের দেখেছি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে সাপ পূজা করতে। তবে বাংলাদেশে অশ্বত্থ গাছের চেয়ে মনসা বৃক্ষের সঙ্গেই সর্পের যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত হয়েছে বেশী। এই মনসা বৃক্ষ হল এক ধরনের cactus। cactus-এর মধ্যে যে উর্বরা শক্তির রীতিমত প্রাধান্য তাতে সন্দেহ নেই। কারণ শুষ্ক মরুভূমির বুকেও তারা বিরুদ্ধ পরিবেশে বেঁচে থাকে দিব্যি প্রাণের স্পন্দন নিয়ে। এবং এদেশেও এই দুইয়ের যোগাযোগকে fertility cult বলেই মনে হয়। কারো মতে এই মনসা বৃক্ষ, সংস্কৃতে যাকে স্নুহীবৃক্ষ, এর বিষনাশক কিছু গুণও আছে। সেইজন্য সম্ভবতঃ সর্পের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে সর্পবিষ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই পুজো করা হয় একসঙ্গে। কিন্তু মনসা বৃক্ষের সর্পবিষ নাশক ক্ষমতা কতটা, তা আজও সন্দেহাতীতভাবে নয় প্রমাণিত। সুতরাং এ-দুয়ের সংযোগ একটা রহস্য। কারো মতে মনসা বৃক্ষ বজ্রপাত নিবারক। বজ্রশক্তি বিদ্যুৎকে প্রাচীনকালে তুলনা করা হত সাপের সঙ্গে। সুতরাং পরোক্ষভাবে সেইজন্যই মনসা বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের যোগ কি না তা ভাববার বিষয়। এই মনসা বৃক্ষ নানা নামে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিরাজ করে। তৈলঙ্গ দেশে একে বলে চে মুড। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মনসাদেবীকে বলা হয়েছে চেংমুড়ি। সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতেও এই দুয়ের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত নিবিড়।

বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মের সঙ্গেই সাপের একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে, এ কথা আমার 'সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে' প্রথম খণ্ডেই বলেছি। পূর্ব ভারতে মহাযান বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মধ্যে এই সাপ আত্মপ্রকাশ করেছিল দেবীর আকারে। বৌদ্ধসমাজে ইনি হলেন জাঙ্গুলী দেবী নামে পরিচিতা। সাপ জঙ্গলে থাকে, সেইজন্যই কি তার দেবী জাঙ্গুলী নামে অভিহিতা? তবে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের জাঙ্গুলী দেবীর যে ভাস্কর্য রূপ, তাতে সামান্য জঙ্গলের সাপ বলে মনে হয় না তাঁকে। এই জাঙ্গুলী দেবী হলেন সবশুক্লা, চতুর্ভুজা, একমুখী এবং শুক্লসর্প বিভূষিতা ও

বীণাপাণি। জাঙ্গুলীর রঙ শুদ্ধ জ্ঞানের ইঙ্গিত দেয়। চতুর্ভুজ চতুর্দিক নিয়ন্ত্রণের প্রতীক। বীণা তল ছন্দে ছন্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধরে রাখার প্রতীক। একে মনে হয় না সামান্য কোন দেবী বলে। অথচ দুই হাতে সাপ, অপর দুই হাতে অভয় মুদ্রা দেখে এঁকে ঠিক পার্থিব সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্পিণী বলে মনে করলেও ভুল হয় না। এবং তা যদি হয় অর্থাৎ জাঙ্গুলী যদি হন পার্থিব সর্পেরই দেবী তাহলে নিশ্চয়ই ভাবতে হবে না, সাপের মধ্যেও লুকিয়ে আছে একটা গূঢ় রহস্য। যে সর্পিণীর সন্ধান করছি আমরা, তাকে যাবে পার্থিব সাপের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া। জাঙ্গুলী দেবীর অবশ্য আছে মূর্তিভেদও। বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন রূপেরও, যেমন, সাধনমালা গ্রন্থে। কিন্তু মূর্তিভেদ বা বর্ণনাভেদ যা-ই থাক, এ মূর্তি একটা অতিপ্রাকৃত শক্তির ইঙ্গিতবহ। সাপকে কেন্দ্র করে কেন এই অতিপ্রাকৃতের ইশারা, তা রীতিমত ভাববার ব্যাপার। মহাযান বৌদ্ধতন্ত্র মতেই হ'ত এই জাঙ্গুলী দেবীর পূজা। এবং আমাদের সর্পিণীও এই তন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত। এর মধ্যে যদি থাকে কোন গূঢ় রহস্য তবে তা ভেবে দেখবার মতই। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি, একসময় ভারতের বিস্তীর্ণ প্রান্তে এই জাঙ্গুলী দেবীর ছিল প্রাধান্য। অথর্ববেদে সর্পবিদ্যা পারদর্শিনী কিরাত কন্যার আছে উল্লেখ। অনেকের ধারণা, সেই কিরাত কন্যাই দেবীত্ব লাভ করে বৌদ্ধতন্ত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে জাঙ্গুলী দেবীর আকারে। আমার বিশ্বাস এতে জাঙ্গুলী দেবীকে দেখা হয়েছে ছোট করে। জাঙ্গুলী বিষহারিণী কোন দেবী নন বরং অতীন্দ্রিয় জগতের দিশারী কোন তান্ত্রিক দেবী।

অনেকে মনে করেন বাংলার বহু বিখ্যাত মনসাদেবীও এই জাঙ্গুলী দেবীরই এক রূপান্তর। তা যদি হয়, তাহলে মনসাকেও চলে না সামান্য বলে চিন্তা করা। যে সর্পিণীর সন্ধানে আমাদের এই অভিযান— তাহলে বাংলার মনসাদেবীর মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে তাঁকে। মনসার বর্ণনায় আছে এই ধরনের কথা :—

'কান্তা কাঞ্চনসন্নিভাং, সুবদনাং পদ্মাননাং শোভনাম্
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাং ফণীময়ীং দিব্যাঙ্গরাগান্বিতাম্।

চার্বঙ্গীং দধতীং প্রসাদমভয়ং নিত্যং করাভ্যাং মুদা
বন্দে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্ ।

আধুনিক কালেও এ ধরনের মন্ত্র আছে মনসার জন্য :

দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাম্
হংসারূঢ়ামুদারামরুনিতবসনাং সর্বদাং সর্বদৈব ।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ-
র্বন্দেহহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং যোগিনীং কামরূপাম্ ॥

এ মন্ত্রের অনেক শব্দের ব্যাখ্যা করলে পার্থিব সর্পের অধিষ্ঠাত্রী কোন দেবী বলে মনে হয় না তাঁকে। বর্ণও অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিতবাহী। 'পদ্মোদ্ভবা' হওয়া সাধারণ একটা কথা নয়। স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে উদ্ভূত। মহাসলিলজাত পদ্মে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্না দেবীরই মাত্র হতে পারে অধিষ্ঠান। হংসবাহন ব্রহ্মাও, সরস্বতীও। শশধরও বদনও কম কথা নয়। তন্ত্রে তো শশধর বা চন্দ্রের রয়েছে অপরিসীম মূল্য। তাহলে মনসাদেবীও কি তন্ত্রের কোন অধ্যাত্ম কল্পনা থেকেই উদ্ভূতা ?

অনেক স্থানে মনসা নামে দেবী আছেন, কিন্তু সর্পের সঙ্গে তাঁর কোন সংযোগ নেই। যেমন, হরিদ্বারের মনসা পাহাড়ের উপর অধিষ্ঠিতা দেবীর সঙ্গে মনসার খুঁজে পাওয়া যায় না কোন সম্পর্ক। মধ্যপ্রদেশের কোন জাতি মনসা নামে পুরুষ দেবতারও পূজা করে। এ দেবতার সঙ্গেও আপাতদৃষ্টিতে সাপের কোন যোগ নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা খুঁজে খুঁজে আবার সন্ধান দিয়েছে এমন এক মনসা মূর্তির, যিনি বাস্তব সাপের সঙ্গে যুক্ত। এমন দেবী আছেন, বিহারের রাজগীরের কাছে মণিয়ার মঠে। এবং পূর্ব পাঞ্জাবের আম্বালা জেলা ও গুঁরগাঁও জেলার মনসা মন্দিরে। তাছাড়া ছোটনাগপুরের রাঁচী জেলার ওঁরাও জাতি যে মনসাদেবীর পূজা করে, তিনিও যথার্থ সর্পরাজ্ঞী। সিংভূম জেলার হো জাতি মাটির ঢিবিতে যে মনসাদেবীর পূজা করে, তা একেবারে জীবিত সাপের আরাধনা। সুতরাং মনসার মধ্যে একদিকে যেমন আছে অতীন্দ্রিয় শক্তির পরিচয়, তেমনই আছে

পার্থিব সাপের প্রকাশও। ঐতিহাসিক অনুসন্ধান অধ্যাত্ম সত্যকে পার্থিব জগতে এনেছে নামিয়ে।

মনসার বিস্তৃত অনুসন্ধানে দেখা যায়, তিনি অধ্যাত্ম জগৎ ছেড়ে আরো বেশী করে নামছেন পার্থিব জগতে। অন্ধ্র দেশের বিশাখাপত্তম জেলার দক্ষিণ ভাগ থেকে আরম্ভ করে নেলোর জেলা পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই নিচু শ্রেণীর লোকেরা করে নাগম্মা বা বালনাগম্মা নামে সর্পদেবীর পুজো। এতে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয় একটি নারী মূর্তির উর্ধ্বাঙ্গ, তাঁকেই বলে নাগম্মা বা নাগমাতা। মহীশূরের ব্রাহ্মণেতর জাতিও অদ্যাবধি পুজো করে মদামা নামে এক সর্পদেবীর। মুদামার যে মূর্তি পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে, নিম্নভাগ সর্পাকৃতি ও উর্ধ্বভাগ মানবীর। অর্ধনাগিনী ও অর্ধনারীর মূর্তি। যেন গ্রীসীয় কাহিনীর মৎস্যনারীর মতই। মধ্যএশিয়ার সাইথিয়ান জাতির মধ্যে 'এলা' নামে অনুরূপ এক নাগকন্যা দেবী হিসেবে হতেন পূজিতা। কারো মতে ভারতে এসেও সাইথিয়ানরা পরিত্যাগ করেনি সর্পপূজা। বৌদ্ধদের 'এলাপত্র' নাগ এই সাইথীয়দেরই অবদান। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে পাঁচপীরের খিচিং নামক স্থানেও কিঞ্চকেশ্বরী (কঞ্চুকেশ্বরী ? কঞ্চুক অর্থ সাপের খোলস) বা খিঞ্চিকেশ্বরী নামে আছে এক সর্পদেবীর মূর্তি অধিষ্ঠিতা। ময়ূরভঞ্জের আরও নানা স্থানে লক্ষ্য করা যায় এই সর্পদেবীর অস্তিত্ব। ময়ূরভঞ্জ তন্ত্রের এক বিরাট স্থান। কিন্তু এইসব সর্পদেবীর সঙ্গে তন্ত্রের অধ্যাত্মতার তেমন কোন সম্পর্ক নেই বলেই অনুমান। মনে হয় সর্পভীতি থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা থেকেই সর্পদেবী হিসেবে ব্যবস্থা হয়েছিল এঁদের পূজো করার।

মাদ্রাজ শহরের প্রাদেশিক জাদুঘরে নানা রূপের কয়েকটি নাগমূর্তি আছে। মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূলে ঘুরলে প্রায়ই অশ্বত্থ গাছের নিচে দেখা যায় সরীসৃপাকৃতি নাগমূর্তি। বাংলাদেশের নাগঘট, পট, মেড়ে বা করণ্ডীতে যেসব নাগ-নাগিনী দেখা যায় তার সঙ্গেও এর আছে বেশ সামঞ্জস্য।

দাক্ষিণাত্যে নানা লৌকিক সর্পদেবীর পুজো দেখা যায় আজ

পর্যন্ত। কানাড়া প্রদেশের এক জায়গায় 'মনে মঞ্চাম্মা' নামে আছেন এক সর্পদেবী। এটি একটি অদৃশ্য সর্পের দৈব নাম। তবে নামের মধ্যে স্ত্রী-অর্থের ইঙ্গিত আছে, সেইজন্য অনেকেই একে মনে করেন সর্পদেবী। বৎসরে একদিন মাত্র এঁর পুজো হয়। মূর্তির মধ্যে 'মনে মঞ্চাম্মার' থানে থাকে বালির স্তূপের মত ছোট একটা স্তূপ। এই স্তূপের সামনেই পুজো হয়। কারো মতে মঞ্চাম্মা প্রাদেশিক উচ্চারণে শোনায় 'মনচা অম্মা'র মত। মনসা অম্মা অর্থাৎ 'মনচা মাতা'। এই এই মনচা অম্মা (মা) 'মনসা মা'তে বাংলাদেশে রূপান্তরিতা। কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত, দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেন রাজাদের সঙ্গে এই 'মনচা অম্মার' পুজা-পদ্ধতি এসেছিল বাংলাদেশে। কর্ণাট বা কানাড়া প্রদেশ থেকেই সেনরা বাংলাদেশে এসেছিলেন বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। তাই বলে তাঁদের সঙ্গে মনসা পুজাও এসেছিল এদেশে তার যথার্থ কোন প্রমাণ নেই। কেউ বলেছেন, বাংলার বেদে জাতীয় সাপুড়েরা সারা ভারত ঘুরে বেড়াতো একসময়। তারাই দক্ষিণ ভারত থেকে 'মনচা অম্মার' পুজা এনেছিল বাংলাদেশে। ঐতিহাসিকদের এ ধরনের অনুমানের কোন মূল্য নেই। কোথাও কোথাও এ ধরনের অনুমান সত্যের কাছাকাছি পৌঁছায় বটে, আবার অনেক সময় সত্যকে এমনভাবে আড়াল করে যে, তার যথার্থ স্বরূপ তখন উদ্ধার করাই হয়ে পড়ে অসম্ভব। যদি তন্ত্রের দিক থেকে বিচার করি তাহলে মনসাকে যথার্থ মনসা অর্থে ধরলেই বা ক্ষতি কি? এই যে মা, তাঁকে মনসা অর্থাৎ মন দিয়ে ধরতে পারলে তবেই তন্ত্রে তিনি মনসা। তাঁর অস্তিত্ব শুধু আছে মনের মধ্যেই। এ অর্থে ধরলে তিনি তখন মোক্ষ দায়িনী সর্পিণী। কিন্তু সে দিক দিয়ে মনসা বা জাঙ্গুলীকে ধরবার কোন চেষ্টা অন্ততঃ মঙ্গলকাব্যের মধ্যে নেই। বরং মনসা অর্থ ধরার জন্য পুরাণের দুয়ারে উপস্থিত হতে দেখি অনেককেই। পুরাণ সত্যের চারদিকে অজ্ঞতাবশতই সম্ভবতঃ রচনা করেছে অদ্ভুত এক প্রহেলিকা, যা থেকে সত্যের বিন্দুমাত্র আর উদ্ধার করা সম্ভব নয় বর্তমানে। যেমন বৌদ্ধ তন্ত্র সাহিত্যের গূঢ়তত্ত্ব চর্যাপদে রক্ষিত হয়েছে যতটুকু, বাংলার

লৌকিক সাহিত্যের রচয়িতাদের 'অজ্ঞতাবশত' তার হয়েছে সর্বনাশ। সত্য তখন গল্প-কাহিনীতে পরিণত। বৌদ্ধ তন্ত্রের গালাগাল সদৃশ বাক্যাবলী বাংলা মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে যথার্থই গালাগাল। যদিও বাংলার বাউল গান সেইসব তান্ত্রিক তত্ত্ব নানা প্রতীক বাক্যে এখনও চলেছে তন্ত্র সত্যের ধারা টেনে। পুরাণ ইতিহাসের একটা সহায় বটে, তবে তা অন্য জঘন্য ধরনের অবলম্বন। সংস্কৃত পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এই ধরনের কিছু পুরাণেই (যাদের আত্মপ্রকাশ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে) সর্বপ্রথম পাওয়া যায় মনসা নামের উল্লেখ। এই পুরাণগুলিতে যেভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে আছে মনসার উল্লেখ, তাতে ধারণা সেকালে মনসার পূজা তেমন হয়ে বসতে পারেনি এ-দেশে। অথচ অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে লেখা কিছু তন্ত্রগ্রন্থে ও পুরাণে, নিবিড়ভাবে পাওয়া যায় শক্তিদেবীর পরিচয়। তন্ত্রে এ সময় সর্পিণী করেছে যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন। অথচ মনসা নামে নেই তার পরিচয়। এ থেকেই ধারণা মনসা নয় সর্বোত্তম শক্তিদেবতা। অর্থাৎ যে সর্পিণী পরমা শক্তি হিসেবে তন্ত্র সাহিত্যে বিরাজিতা তিনি মনসাদেবীর সঙ্গে এক নন। তিনি নন 'সুপ্তা জগন্মোহিনী।' এই জগন্মোহিনীর আকার নয় মনসা রূপে, সর্পরূপে যাকে 'সর্পসমা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে তন্ত্রে। এই সর্পের নিবিড় সম্পর্ক শিবের সঙ্গে। অবশ্য মনসারও যে শিবের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তা নয়। সুতরাং দেখা যাক আর একটু এগিয়ে।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে বাংলাদেশে পাওয়া গেছে যেসব মনসা মূর্তি বা নিদর্শন, তা দেখে পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা, বাংলাদেশে মনসার আবির্ভাব খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এবং বেশ ব্যাপক-ভাবেই। পুরাণ বলুক না যা-ই কেন তন্ত্রের উদ্ভব ৮ম শতকে। যদিও তার স্ফুটনোন্মুখী ভাব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভেই। তন্ত্রে সর্প রয়েছে মানসে মাত্র। সেই মানসী সর্পই কি মনসা?

বীরভূমের পাইকরে পাওয়া মনসা মূর্তির মাথার উপর আছে সাত সাতটি সাপের ফণা। তন্ত্রে ষট্চক্রের পরে সপ্তম পর্যায়ে পরম মুক্তি।

সাতটি ফণার সঙ্গে তার কি আছে কোন যোগাযোগ? যদিও দেবীর পার্শ্বচিত্রে হয়েছে নানা লৌকিক বিশ্বাসের স্থান, তবুও. সাতটি সর্পফণা বোধহয় বিশেষ রকমে ইঙ্গিতবহ। আসামে পাওয়া গেছে হস্তীর উপর আসীনা মনসা মূর্তি। তন্ত্রে হস্তীরও বিরাট মূল্য। তন্ত্রের সঙ্গে যাদের কোন যোগ আছে, তাঁরা বাংলার অনেক মূর্তির মধ্যেই খুঁজে পাবেন তন্ত্রের লক্ষণ।

জৈনদেবী পদ্মাবতীর সঙ্গেও বাংলাদেশের মনসাদেবীর আছে নিবিড় যোগ। কেউ কেউ পদ্মাবর্তী ও মনসাকে মনে করেন অভিন্না বলে। মনসারই এক নাম পদ্মাবতী। মনসা পূজাকে এজন্য পূর্ববঙ্গে বলতে শুনেছি পদ্মাপূজা। জৈনধর্মের এই পদ্মা কে তা জানি না। পার্শ্বনাথের যক্ষী বা শাসনদেবীর নাম জানি পদ্মাবতী। তিনি চতুর্হস্তা ও কুক্কুটবাহনা। বজ্র অংকুশ, পুষ্পপাশ, সুবর্ণফল ও রক্তপদ্ম বা কুমকুম তাঁর চার হাতের আয়ুধ। এক সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর ছিল বিপুল জনপ্রিয়তা। যক্ষ সর্পের প্রতীক। ধরণেন্দ্র যক্ষ পার্শ্বনাথকে সাধনায় করেছিলেন সহায়তা। পদ্মাবতী যক্ষ নয় যক্ষিণী। অর্থাৎ সর্পিণী। পার্শ্বনাথের সাধনার সহায়ক। তন্ত্রের সর্পিণীও পরম পথের সহায়ক। সুতরাং মনসা যদি পদ্মাবতী হন, তাহলে তিনি শুধুমাত্র লৌকিক দেবী, এমন নাও হতে পারে। তাঁর একটা তান্ত্রিক গুরুত্বও থাকতে পারে আড়ালে। ফলে আর একটু এগিয়ে গিয়েই দেখা যাক।

বাংলাদেশের মনসা যে আসলে কে, তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা বিভ্রান্ত। মহাভারতের গল্পকাহিনীর বাসুকি-ভগ্নী জরৎকারু যে মনসা রূপে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশে সেরকমও মনে হয় না। কারণ জরৎকারু কদাচ সর্পমাতা বা রাজ্ঞীর সম্মান পাননি কোথাও। সর্পমাতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন শুধু কদ্রুই। তবে মনসা কে? কবেই বা এলেন হিন্দু সমাজের শাস্ত্রগ্রন্থে? মহাভারতে মনসা নামের উল্লেখ নেই। মহাভারতের যুগের দীর্ঘকাল পরে পরবর্তী উপপুরাণগুলি যখন লেখা হয়, তখন অবশ্য অনেকগুলি পুরাণেই তাঁর

নাম পাই। সমকালীন ভাস্কর্যেও মনসার অস্তিত্ব বিরাজমান। মনসার আভিজাত্য রক্ষা করতে তাঁকে নাগকুলের পিতা কশ্যপের সঙ্গেও করা হয়েছে যুক্তা। অনেক সময় শিবের কন্যা হিসেবেও কল্পনা করা হয়েছে মনসাকে বিশেষ করে মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলিতে। পশুপতি শিব অনেক পুরানো দিন থেকেই সাপের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং পরবর্তী সর্প-রাজ্ঞীকে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করতে অসুবিধা দেখা দেয়নি খুব একটা। তবে শিবের কণ্ঠলগ্ন সর্পের সঙ্গে মনসার কোন সম্পর্ক আছে বলে ধারণা নয়। বরং তিনি শিবশিষ্যা হিসাবে চিহ্নিতা। জন্মের পর তিনি বেদাদি অধ্যয়নের জন্য গিয়েছিলেন কৈলাস ভবনে শিবের কাছে এবং এসব বিষয়ে অর্জন করেছিলেন বিশেষ পারদর্শিতাও। শিবের কাছে বেদ অধ্যয়ন করতে যাওয়া দেখে মনে হয়, মনসাও অনার্য জগৎ থেকে আগতা। শিব যে অনার্য এবং বেদবিরোধী এর প্রমাণ মেলে শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষের সমর্থকদের সঙ্গে শিবের অনুচরদের তর্ক-বিতর্কে। পরে অবশ্য সুচতুর ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় সবাইকে টেনে আনা হয়েছে হিন্দুধর্মের মধ্যে। শিব তন্ত্রের উদগাতা। তন্ত্রের নানা ক্রিয়া ঘোরতর বেদ-বিরোধী। অথচ শিবকেও পরবর্তী কালে চিহ্নিত করা হয়েছে বেদজ্ঞ হিসেবে। গৌতম বুদ্ধের মত ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতির বিরোধী কে? অথচ তাঁকেও স্থান দেওয়া হয়েছে হিন্দুদের দশাবতারে। দশাবতারের অনেক মূর্তি থেকে প্রমাণ হয় নানা অনার্য কাহিনী হিন্দুশাস্ত্রে এসে করেছে স্থান লাভ। কাহিনীর নায়করা দশাবতারের বিভিন্ন অবতার হিসেবে হয়েছেন চিহ্নিত। মৎস্য অবতারের মৎস্য ও কূর্ম অবতারের 'কূর্ম' কোন অনার্য totem. বরাহ অবতারের নরদেহী অবতারের বরাহকুলও totem বা অভিজ্ঞান। নৃসিংহ যথার্থই কোন অর্ধনর ও অর্ধসিংহ নয়। সিংহমুখ হল টোটেম। অনার্য বরাহ ও সিংহমুখ অভিজ্ঞানধারী কোন মহাপুরুষকেই এরা হয়তো বাধ্য হয়ে স্থান দিয়েছে হিন্দুধর্মে। বামন অবতারও হয়তো অনার্য নন। আর্যরা দীর্ঘকায়, বামন নয়। ভারতের কোন অনার্য বামনকায় উপকাহিনীর নায়কই হয়তো বামন

অবতার হিসেবে স্থান পেয়েছেন দশাবতারে। সুতরাং শিব যে আর্যদের চোখে বেদজ্ঞ হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? এক সময় তা অনার্য প্রভাবে প্রভাবিত বলে অথর্ববেদ হয়নি ব্রাহ্মণ সমাজে স্বীকৃত। পরবর্তীকালে আথর্বণবিধি না হলে ব্রাহ্মণ বলেই কেউ পেতেন না স্বীকৃতি। ব্রাহ্মণদের এ ধার্ষ্টামির সীমা নেই। বাধ্য হলে গ্রহণ করে, সুযোগ পেলে ঘাড়ে ধরে। মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারতের নিম্নশ্রেণীর মানুষ ভক্তি আন্দোলনে বিঠল দেবকে পাওয়ালেন স্বীকৃতি। বিঠল দেবের মন্দির উঠল। শেষপর্যন্ত ব্রাহ্মণরাই হলেন সেই মন্দিরের সর্বেসর্বা। নিম্নশ্রেণীর রইল না মন্দির ঢোকারই অধিকার। ব্রাহ্মণদের লীলাখেলার অন্ত নেই। শিবের কাছে মনসার বেদশিক্ষার গল্পকথা, বাধ্য হয়ে মনসা ও শিবকে গ্রহণকরা ব্রাহ্মণদেরই কাজ হয়তো। কিন্তু সে কথা থাক। মনসা আর্য কি অনার্য, আমার তা বিশ্লেষণের ব্যাপার নয়। মনসার যাথার্থ নিরূপণ করাই লক্ষ্য। যে সর্পের সন্ধান আমি করছি মনসা সেই সর্প কিনা, সেটাই আমার বিচার্য। ইতিহাস আমার সে অভীষ্ট পূর্ণ করতে পারে নি। মনসার সঠিক তথ্য ইতিহাসে নয় প্রমাণিত। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে মনসাকে ঠেলে তুলবার একটি অপচেষ্টা। সে প্রচেষ্টা সত্যকে আরও আড়াল করেছে সব প্রকটিত করতে পারে নি এতটুকু। শঙ্কর ও শিবের কাছে মনসাকে দাঁড় করানো হয়েছে শিষ্যারূপে, আবার তাঁদেরই আরাধ্যা হিসেবে অঙ্কিত করা হয়েছে একটু পরে। অজ্ঞাত এক কেন্দ্র থেকে উঠে এসে তিনি দেখছি লাভ করছেন ত্রিলোকের পূজা। বেদে সব দেবতাকেই একটা সর্বশ্রেষ্ঠতা দেওয়ার যে ছিল মানসিকতা মধ্যযুগের ভারতবর্ষেও দেখছি সে প্রচেষ্টার ক্ষান্তি নেই। অনার্য শিব হলেন আর্য দেবতা। তাঁরই ভক্ত ধনপতি সওদাগর। তিনিও দেখছি মনসাকে এক সময় ঘৃণা করেছেন 'কানী' ও 'চেংমুড়ি' নামে অভিহিত করে। অথচ একদিন সেই মনসাই হলেন ত্রিলোকের বন্দিতা। মহাভারতের ইতিহাস মধ্যযুগের ভারতে দেখছি অবলীলাক্রমে অস্বীকৃত। বাসুকির ভগিনী জরৎকারু ও মনসা দেবী একাকার হয়ে গেছেন এ সময়, যেমন,

'জরৎকারুমুনেঃ পত্নী ভগিনী বাসুকেরপি।
আস্তিকস্য মুনের্মাতা মনসাদেবী নমোহস্তুতে॥

ইতিহাস ব্যর্থ হলেও রন্ধ্রপথে কোথাও কোথাও সত্য ঠিকই উঁকি দেয়। লৌকিক সাহিত্যের ফাঁকে ফাঁকে অনেক সময়ই মনসার ক্ষেত্রে দেখি অলৌকিকতা বিদ্যমান। যেমন, হরিদত্ত নামে 'মনসা মঙ্গল'এর এক কবিকে বলতে শুনি :

কবি কহে হরিদত্ত, যে জানে পরম তত্ত্ব
মনসা দেখিল বিদ্যমান।

পরম তত্ত্বের সঙ্গে মনসার সম্পর্ক দেখেই মনে হয়, সেই যে ছোট বেলায় আমার গ্রামের শ্মশানকালীর আসনের কাছে বটগাছের নিচে তান্ত্রিকের কণ্ঠে শুনেছিলাম 'সাপকে ভয় কিরে? সাপই যে সব রে!' মনসা হয়তো সেই সাপ। পরমতত্ত্বে জ্ঞানী ব্যক্তিই পারেন তাঁকে দেখতে। মনসা সর্পরাজ্ঞী হলেও তাঁকে নেই ভয়ের কিছু। বিজয় গুপ্তের রচনায় তাই দেখতে পাই :

"প্রেতের সঙ্গে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।'

শিবের মাথায় এই নারী যদি মনসা হন, তাহলেও আছে এর তান্ত্রিক কোন তাৎপর্য। যে সর্প আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি তিনি সে সর্পও হতে পারেন। বিজয় গুপ্তের রচনায় আর এক জায়গায় দেখতে পাই, তিনি শিবের স্ত্রী চণ্ডীর আক্ষেপ বর্ণনা করছেন তাঁর কাব্যে :

'চণ্ডী বলে সখী মোর দুঃখের নাহি ওর।
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর।'

এই পরনারী যদি মনসা হন তাহলে তন্ত্রের সঙ্গে এর রয়েছে সামঞ্জস্য। তন্ত্রে শিব সর্পিণীর সঙ্গেই খেলেন লুকোচুরি। তবে, এই সর্পিণী মনসা না কালী? চণ্ডী নাও হতে পারেন। কারণ, লৌকিক চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী শিবের পত্নী হলেও 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' গ্রন্থের চণ্ডী কিন্তু শিবের কেউ নন। তিনি শিবেরও ঊর্ধ্বে বৌদ্ধ প্রজ্ঞাপারমিতার মত পরমা শক্তি। তবে প্রজ্ঞাপারমিতার মত নির্গুণ নন, সগুণ। তিনি মহাশূন্যরূপিণী পরমা প্রকৃতি, আবার তিনিই সগুণ দুর্গা, দুর্গতি বা

দুর্গরক্ষিণী। তিনি মহিষাসুরমর্দিনী। (মহ + ঈষ = মহিষ। মহা + ঈশ হলেন মহেশ বা মহেশ্বর শিব। এই মহেশ্বরের 'ঈশ' ক্রিয়া যখন মূর্ধ্বা-উষ্মা (kinetic energy level) প্রাপ্ত হয় তখন 'ঈশ' হয় 'ঈষ' অর্থাৎ kinetic energy. তখন ঈষ ইষু হয়ে ছুটে যায়। এই ঈশের মহ বা মহত্ত্বযুক্ত ভাব মহিষ সর্বদা অস্থির, ছুটে যাবার জন্য উন্মুখ (অস + উ) এবং অগ্নিশক্তি(র) যুক্ত ; অর্থাৎ এই energy তখন অসুর।) এই মহিষই যখন সতীর সৃষ্টিক্রিয়ার ব্যাঘাত। সেই জন্য চণ্ডী তাকে বধ করেন। এই চণ্ডী শিবেরও উর্ধ্বে। শিবের 'ঈষ' গুণকে দমন করেন। মহা + ঈশ = মহেশই যে মহা + ঈষ তার প্রমাণ মহেন-জো-দাড়োর মহিষশৃঙ্গধারী শিব। মহেশ্বরের সঙ্গে যে শক্তি লীলাচঞ্চলা থেকে তাঁকে করেন মহিষ, তিনি চণ্ডী নন, চণ্ডী সেই শক্তিরও উর্ধ্বে। আদিবুদ্ধের প্রজ্ঞাপারমিতার মত যদিও তিনি পরম শিবের শক্তি তবুও তাঁর উর্ধ্বে। তাঁরই সক্রিয় অংশ হলেন শিব। শিবের সক্রিয় অংশ শক্তি। চণ্ডীর পক্ষে এই জন্যই শিব পরনারী নিয়ে লীলামত্ত, এ ধরনের অভিযোগ আনাই সম্ভব। এই পরনারী তন্ত্রের মতি সর্পিণী। এই সর্পিণীই যদি মনসা দেবী, তাহলে যথার্থই আমার ভাববার আছে। কিন্তু তন্ত্রের সর্পিণীর দিকে মনসা মঙ্গলের ইঙ্গিত বড় বেশী রকমে ক্ষীণ। সেখানে স্থূল উপাদানের ছড়াছড়ি বেশী। তবে মাঝে মাঝেই যে অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিত নেই তাও নয়। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের প্রারম্ভেই আছে :

"সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গল গীত
বিস্তারে কহিব সপ্তনিশি।

'সপ্তনিশি' শব্দটিই সর্বশেষ অর্থের ভাববাহক। ষট্‌চক্র হল বস্তু জগতের ছয়টি মায়ার পর্যায়, সুতরাং পরম চেতনার কাছে অন্ধকারের তুল্য। এই ছয় চক্র পার হলেই যে দিনের আলো, তা নয়। আগত শেষরাত্রির অন্ধকার। পরমের জ্যোতির তুলনায় আজ্ঞা-চক্রভেদী আলো উষার আলোর চাইতেও ক্ষীণতর। সেই জন্য সপ্তনিশি অপেক্ষা করলে, পরম আলোর সন্ধান পাওয়া যায় সর্বশেষে।

তন্ত্রে সর্পিণীই সেই আলোর সন্ধান দিতে পারে। সুতরাং মনসার কাহিনী ব্যক্ত করতে হবে সপ্তনিশি। দ্বিজ বংশীদাসের এ পদটিও ভাববার মত :

'যত ডিঙ্গা ডুবাইছে সকলে লইব পাছে
সে কানীর লাগ পাই যথা।'

সওদাগরের যত বাণিজ্যতরী ডুবেছে, যত লোক মরেছে, সবই পাবেন তিনি আগে কানীর নাগাল পেয়ে নিন। কানী অর্থাৎ সর্পিণী মনসার সন্ধান পেলে জীবনের সব বিপর্যয় তিনি পারবেন কাটিয়ে উঠতে। কিন্তু তিনি ভক্তির পথে যাবেন না, যাবেন সংগ্রামের পথে। যোগ সাধনা সংগ্রামেরই পথ, বীরের পথ। এখানে আকূতি নেই, আছে জয় করার আনন্দ। সেই জন্য সপ্তডিঙা ডুবলে লোকে যখন ভেঙে পড়েছে আকুল ক্রন্দনে চাঁদ সওদাগর তাঁদের ধমকে উঠছেন কাতর না হতে। কারণ তাহলে কানী হাসবে :

'কাতর হইলু জানি হাসিবেক লঘু কানী
সেহি মোর বড় দুঃখ লাজ।'

সাধক কমলাকান্তের মতই তাঁর সংগ্রাম :

'আয় মা সাধন সমরে
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।

যদিও লৌকিক কাহিনীতে এ ধরনের সংগ্রাম ছিল না, তবু কখন কখন কবির অবচেতন মন থেকে সর্পিণী সত্যই যে প্রকাশিতা হয় নি এ কথা বলতে পারে কে? ভারতচন্দ্রের অন্নদা পাটনির মধ্য দিয়ে যেমন তাঁর সমাজচেতন মনের প্রকাশ হয়েছিল একটি বাক্যে :

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

তেমনই হয়তো সর্পিণী-সত্যের প্রকাশ। কিন্তু এ সত্য বড় অপ্রকাশ। এ থেকে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা নয় সম্ভব। মনসামঙ্গলের সকল কবি তাঁকে শেষ পর্যন্ত পরমাগতি হিসেবে ফতোয়া দিলেও লৌকিক কাহিনীর বিস্তারে মনসা হতে পারেন নি সেই পরমা সর্পিণী। এ সর্পিণীকে সাহিত্যে বা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেই

আমার বিশ্বাস। এ সর্পিণী-বিদ্যা জানা যেতে পারে অতিবাস্তব সর্প পূজারীর কাছ থেকেই শুধু। সুতরাং যথার্থ সর্প তান্ত্রিকের সন্ধান না পেলে এ রহস্য ভেদ হবে না কোনদিনই, আমার অধ্যাপক বন্ধু আমাকে যে উপদেশই দিন না কেন। সর্প রহস্য ভেদ করতে হলে সর্প তান্ত্রিকেরই সন্ধান করতে হবে দুর্গমে দুস্তরে।

তিন

সাপ নিয়ে অসম্ভব কৌতূহলের আমার অন্ত নেই। এই কৌতূহল আমার আরও বেশী বেড়েছে দুধচটির পথের ধারে সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে। কিছুটা জানলাম, বাকিটকু জানা হোল না এর চেয়ে বড় অস্বস্তিকর অবস্থা বোধ হয় আর নেই। শুনেছি আহত সাপ আঘাতকারীকে আঘাত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। আমার কৌতূহলও যেন আহত সাপের মত। যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণটা জানতে পারছে ততক্ষন তার শান্তি নেই, সে থামবে না। সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের জ্ঞান যে আমার কৌতূহল তৃপ্ত করতে পারবে না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের বিচার বাস্তব বিচার। তাদের বিচার বৈজ্ঞানিক। ইতিহাসে তথ্য সংগ্রহ আছে। বাস্তব বুদ্ধিতে তথ্য বিচারের প্রয়াস আছে। কিন্তু কোন জিনিসের সত্যিকারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার ক্ষমতা বাস্তব বিদ্যাবুদ্ধির আছে বলে মনে হয় না। মানুষের দেহটা বাস্তব, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে যে পরমাত্মার বাস সেটা বাস্তবাতীত। বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ দেহ নিয়ে কম হয়নি। কিন্তু জীবনের উৎসটা যে কোথায় সেটা ধরা সম্ভব হয় নি আজও। সম্ভব হলে মানুষ আর একটা প্রাণময় জীবন তৈরী করে ফেলতে পারত। বিজ্ঞান দিযে বাস্তব চরিত্র ধরা যায়, প্রাণের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই জন্যই হয়েছে পরাবিজ্ঞানের সৃষ্টি। এই পরাবিজ্ঞানকে দর্শন বললেই মানায় ভাল। গভীর আন্তর দর্শন ছাড়া প্রাণের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব।

বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে অতিবাস্তব এই প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাবে না বলেই আমার মনে হল। এ সাপ বাস্তব সাপ নয়; এ হল অতিবস্তু-সর্প, অতিবাস্তুসাপ। ইতিহাস এর অনুসন্ধান দিতে পারবে না। তথাকথিত মনসামঙ্গলে এর ইঙ্গিত নেই। পঞ্চনাগের ঘট, মনসাপূজা বা পদ্মাপূজার মধ্যে এ সাপের হদিস পাওয়া অসম্ভব। পরমাত্মার মত এরও সন্ধান অন্তরাত্মার মধ্যেই করতে হবে। এরও অস্তিত্ব হয়তো অবাঙ্‌মানসগোচরম। দুধচটির পথের ধারে দেখা সেই ধরনের কোন সাধুসন্তের সাক্ষাৎ পেলে তবেই তিনি হয়তো এ রহস্যের আবরণ ভেঙে আমাকে সত্যের সন্ধান দিতে পারেন।

মানুষের মনটা একটা বিচিত্র জিনিস। দেহের মধ্যে যে বসে থাকে, ইন্দ্রিয়কে পরিচালিত করে, তার একটা অস্তিত্ব আছে ঠিকই, অথচ তার স্বরূপ ধরা যায় না। যে মন আমাকে দুরন্ত কৌতূহলে সাপের সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে সেই মনই আবার মাঝে মাঝে সন্দেহের ছায়া ফেলে দোদুল্যমান করে তুলছে আমাকে। কখনও কখনও মনে হয়, আমি অবিশ্বাস্যের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সাপের অস্তিত্ব যথার্থই হয়তো নেই। তান্ত্রিকের জাদুতে মোহাচ্ছন্নের মত ঘুরে মরছি। ছোটবেলা দেখা আমার গ্রামের সেই বটগাছের নিচের তান্ত্রিক বা দুধচটির পথের ধারের সন্ন্যাসী আমাকে যথার্থই জাদু করেছে। আবার ভাবি, তান্ত্রিকও মানুষ, আমিও মানুষ। তাহলে তান্ত্রিকের মধ্যে অসামান্য এই ক্ষমতার জাগরণ হল কি করে! আমি তো পারি না কাউকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করতে, মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে! আমাদের সাধারণ জ্ঞানের ঊর্ধ্বে কিছু একটা না থাকলে এমন হয় কি করে? বৈজ্ঞানিক **Pascal** যথার্থই বলেছিলেন **"The heart has its reason of which reason knows nothing"**. বস্তুবিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক পশ্চিম দেশেও তো আজ দেখছি বস্তুর অতীত সন্ধানে চলছে আকুলিবিকুলি। তাঁদের অনুসন্ধান চলেছে **'Beyond the Ego'**। মনের গভীর অভ্যন্তরের রহস্য তাঁদের যেমন বিভ্রান্ত করেছে তেমনই

করেছে বস্তুবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা। আইনস্টাইনের চতুর্থ ডাইমেন-শনের ধারণা তাঁদের চিন্তার জগতে ঝড় বইয়ে দিচ্ছে। পশ্চিমের চিন্তার জগতে আজ মস্ত হাওয়া বয়ে চলেছে। সোজাসুজি কথা বলতে গিয়ে বলতে পারছে না। বাস্তব জীবনের স্বাভাবিকতাকেই আজ তাদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। তাই উপন্যাসে লজিকাল কথাকে আজ তেমন মূল্য দেওয়া হয় না। কাব্যে শিল্পে, আপেক্ষিক গতিরও কোন মূল্য নেই। ইউরোপের গল্প উপন্যাসের কাহিনী আজ কোথায় আরম্ভ হচ্ছে বলা যায় না। ভাষার মধ্যেও যায় না পারস্পরিক সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া। অধিবস্তুবাদী সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে আন্দ্রেঁ ব্রেতোঁ তিব্বত ও ভারতের তন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। বস্তু-সত্যের উৎস যে সত্য, সেই সত্যের জন্য ইউরোপ আজ ব্যাকুল। সুতরাং বস্তুর অতীত অতিবস্তু যে নেই, তাই বা বলি কি করে! সত্যি অর্ধেক জানার মত যন্ত্রণা নেই। সাপ আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না এক মুহূর্তও।

মনে মনে অলৌকিক সাধুসন্ন্যাসীরই খোঁজ করে ফিরি। কিন্তু শহরের কলকোলাহলে, ঘর্মাঘিঞ্জিতে সাধু পাব কোথায়? মাঝে মাঝে কাগজে নানা ব্রহ্মচারী, স্বামীজী, প্রভৃতির বিজ্ঞাপন দেখি। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ব্রহ্মচারীরা ও স্বামীজীরা অমৃতলোকের পরশ পেয়েও কেন যে মসিলিপ্ত শহরের মানুষের মধ্যে আনন্দ খুঁজতে আসেন আমার মাথায় তা খুলে না। এ জন্য এঁদের সম্পর্কে কোন আগ্রহ জন্মে না। তাঁদের কাছে যাইও না। আবার সাধুসন্তের খোঁজে গিরিগুহায়, অরণ্যে-নির্জনে দূরদূরান্তে সন্ধান করতে যাব এমন সময় ও আর্থিক সঙ্গতি হয়ে ওঠে না। সুতরাং অসহায়ভাবে পড়ে পড়ে মারই খাই শুধু।

যথার্থই ক্লান্ত হয়ে একদিন ঘরের কাছেই একটু ফাঁকা জায়গায় প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিতে ছুটে গেলাম। জায়গাটা হাওড়া থেকে খুব দূরে নয়। দু'শ দশ মাইল মাত্র। লুপ লাইনে উত্তর ভারতের দিকে এগিয়ে গেলে সাঁওতাল পরগনা জেলার সাহেবগঞ্জ স্টেশনের

দু'স্টেশন আগে মাত্র। নাম সুখসেনা। মহারাজপুর স্টেশন থেকে নেমে উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে হয়। এমন মনোরম স্থান ভূ-ভারতে খুব কমই আছে। বিজ্ঞাপনের অভাবে পর্যটকের দল এর সন্ধান জানে না বটে, তবু যথার্থ সৌন্দর্যের তার হানি নেই। বোধহয় বিজ্ঞাপনের বাইরে নিভৃতে ঘোমটা টেনে আছে বলে আজও সে সুন্দরী কুমারীই রয়ে গেছে। সভ্যতার বলাৎকার প্রকৃতির যে অঞ্চলেই পড়েছে তার আর কুমারীত্ব অবশিষ্ট নেই। দেবভূমি হরিদ্বারেরও শুনি সৌন্দর্যহানি ঘটেছে ইদানীং কালে। অথচ প্রায় কুড়ি বছর আগেও হরিদ্বারের দেহে যথার্থই অতিপ্রাকৃতের ছোঁয়া ছিল।

সুখসেনা কোন্ সুখের সেনার জন্য গড়ে উঠেছিল কে জানে। তার অঞ্চলে আজ যারা থাকে সভ্যজগতে এত অবহেলিত মানুষ আর নেই। পরনে বস্ত্র নেই, পেটে অন্ন নেই। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ অহরহ। থাকবার মধ্যে আছে শুধু নির্ভেজাল একটু প্রকৃতি। প্রকৃতি যে চরম সুখের উৎস সে বিষয়ে আর সন্দেহ কোথায়। এই জন্যই কি এ অঞ্চলের অধিবাসীরা কোনদিন সুখসেনা নামে পরিচিত হয়েছিল? এবং তাদের থেকেই কি স্থানের নাম সুখসেনা? জানি না। বিশ্লেষণী মন নিয়ে অবিশ্লেষী প্রকৃতিকে ক্ষতবিক্ষত করে লাভ নেই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যথার্থই বলেছিলেন 'We murder to descet'. ফুলকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হত্যা করে লাভ নেই। ফুলের সৌন্দর্য ততক্ষণ যতক্ষণ সে ফুল। বিশ্লেষণ করলে পাপড়ি, রেণু, গর্ভকোষ, ইত্যাদি নানা জিনিস বেরিয়ে আসবে, ফুল আর থাকবে না। সুখসেনা সুখসেনাই থাক, তাকে বিশ্লেষণের আমার প্রয়োজন নেই।

রাজমহল পাহাড়ের সংকীর্ণ এক কোলে এই সুখসেনা। পশ্চিমে রাজমহল পাহাড় অর্ধচন্দ্রের মত অর্ধ বৃত্তাকার হয়ে স্থানটিকে ঘিরে ধরেছে। উত্তর ও দক্ষিণে আর কিছু অংশ বেঁকে এসে বেষ্টন করেছে ঝর্ণাধারা সিঞ্চিত সামান্য একটু অঞ্চলকে। পূবে পাহাড়ের অর্ধ বৃত্তাকার দুই উৎক্ষেপকে স্পর্শ করে বয়ে গিয়েছে পুণ্যসলিলা গঙ্গা। গঙ্গার জলরেখা ও দুই উৎক্ষেপের মাঝখানে শ'খানেক গজ করে যে

সমতল আকার ভূমি, তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে উত্তর-পূর্ব রেলপথের লুপ লাইন। স্থানটির ইতিহাস আছে। বঙ্গদ্বার তেলিয়াগড়ি অঞ্চলের একটি অংশ এই স্থান। ইতিহাসের কিছু নিদর্শনও আছে। বছর পঁচিশেক আগে এখানেই সকরিগোলিতে মাটি খুঁড়ে পালযুগের ইতিহাসের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। পাহাড়ের গায়ে এখনও কিছু কিছু প্রাচীন ইমারতের অবশিষ্টাংশ খুঁজে পাওয়া যায়। পাহাড়ের উৎক্ষেপে পাওয়া যায় কিছু সাধুসন্তের আশ্রম। গুহাতে কিছু গুহাবাসী সন্ন্যাসীর সংবাদ। প'হারী বাবা, ফলাহারী বাবা, নানা সাধুবাবার আস্তানাও আছে। জানিনা—অবচেতন মন আমাকে সেইজন্যই এখানে ঠেলে এনেছিল কিনা, তবে ক্লান্তি অপনোদন করতে এখানেই এলাম। ছোটবেলা এখানেই থাকতাম আমরা। এখনও ভগ্নপ্রায় বাড়ি আছে। বংশধর একজন ব্যক্তিও আছেন। সেই ভাঙা বাড়িতে এসেই উঠলাম।

আমি পাহাড় দেখেছি, পর্বতও দেখেছি, সমুদ্রও দেখেছি। অতলান্তিক ও তীরহীন সমুদ্রের বিশালতায় একটা অনন্তের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু কয়েকদিন থাকলেই সমুদ্র ক্লান্তি ধরায়। অথচ তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গে অনন্ত, অব্যক্ত ও অতীন্দ্রিয় আহ্বান আছে। পাহাড়ের গৈরিক কোলেও অতীন্দ্রিয় জগতের একটা সাড়া পাওয়া যায়। পাহাড় পর্বত আমাকে কোনদিন ক্লান্তি ধরাতে পারেনি। সকালের রোদে পাহাড় ঝলমল করে। বিকেলের হলুদ রোদ অপূর্ব মায়া বিস্তার করে। তখন মনে হয়, পাহাড়ের কোলে জগৎ-রহস্যের বাণীকে কুড়িয়ে বেড়ালে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

সুখসেনার পশ্চিমে প্রাচীরের মত একটা পাহাড়ের গা গৈরিক মৃত্তিকা আচ্ছন্ন করে আছে সবুজ গাছপালা। এরই মাঝখানে কোথাও কোথাও বা ধূসরতা চোখে পড়ে। কোথাও চোখে পড়ে পাহাড়ের মাটির সঙ্গে রঙে রঙ মিলিয়ে গৈরিক ঘাস, বিশেষ করে শীতের সময়। শীতের সময় রাজমহল পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্য।

ছোটবেলায় বহুদিন এখানে কাটিয়েছি। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির

পরিবর্তন দেখেছি অনেক। বসন্তে ফুলে ভরে উঠতে দেখেছি পাহাড়। প্রজাপতি উড়তে দেখেছি। কোকিল ডাকতে শুনেছি। গ্রীষ্মে পাহাড়ী ফলের সমাহার দেখেছি। বর্ষাতে মতিঝর্ণাকে বিপুল গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুনেছি নিচে। শীতের সময়কার তার শীর্ণ ধারাকে রুপোলী ছটা বিস্তার করে বিস্তৃততর হতে দেখেছি বর্ষায়। ময়ূরের পেখম মেলা দেখেছি অকৃত্রিম এই প্রকৃতির কোলে কতবার। কখনও একা নির্জন পাহাড়ের চুড়োয় উঠে আদিম অরণ্যে বাঁদরদের দেখেছি। আর কেন যেন আমার বারবার কিষ্কিন্ধ্যার বানরদের কথা মনে পড়েছে। অন্তরের অভ্যন্তরে মনের এই রহস্যময় খেলার স্বরূপ কে ব্যাখ্যা করতে পারে! সুখসেনার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাজমহল পাহাড় যেখানে পূর্বদিকে বাঁক সৃষ্টি করেছে সেই বাঁকের উপর থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মতি ঝর্ণা। শিবচতুর্দশীতে সেখানে বিরাট মেলা বসে। ছোটবেলা কতবার সেখানে গিয়েছি। ইতিহাসের কিছু চিহ্ন আজও সেখানে বর্তমান আছে। রাজা মানসিংহ যখন বাংলাদেশে মোগল সুবাদার ও সেনাপতি তখন তিনি সেখানে একটি জলাধার তৈরি করে দিয়েছিলেন। ছোট ছোট ইটের তৈরি সেই জলাধারের গায় মধ্যযুগের ভারতবর্ষের গন্ধ এখনও জড়িয়ে আছে।

ছোটবেলার সেই স্মৃতির ছায়া ধরে একা একা পাহাড়ের কোলে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ছোটবেলার স্মৃতি জড়ানো স্থান বড় হয়ে দেখলে আরও ভাল লাগে। পাহাড়ের গা ঘেঁষেই শেরশাহের গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড চলে গেছে। সেই পথের উপর মধ্যযুগীয় ইঁটে গাঁথা একটি সাঁকো আছে, নাম পিঠেবেঁচুনীর সাঁকো। এর পেছনের ইতিহাস অজ্ঞাত। কিন্তু অকথিত কাহিনী যেন মহাকালের নিঃসীম নিশানা ধরে এগিয়ে গেছে। পিঠেবেঁচুনীর সাঁকোর ধারে একদিন একটি প্রকাণ্ড কালো জাত সাপ দেখতে পেলাম। ভয়ঙ্কর, কিন্তু চমকপ্রদ। যেন মহাকালের সঙ্গে মিশে যাওয়া একটি অব্যক্ত প্রতীক।

'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' এ অতি ইউনিভার্সাল সত্য কথা। এ কথার যথার্থ মর্ম এই সুখসেনা এসে যাঁরা পাহাড়ের কোলে

সাঁওতালদের দেখতে না পাবেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন না। এমন নিখুঁত কুঁদে কুঁদে তৈরি করা স্বাস্থ্য কম দেখা যায়। এমন কালো পাহাড়ী মাটিতে নিকানো ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ঘর তুলনাবিহীন। সাঁওতাল পল্লীর পাহাড়ী পথে যদি মোষ চরতে দেখেন, আঙিনায় ছেড়ে দেওয়া ছাগল দেখেন, ঝর্ণার ধারে পড়ে থাকা শুয়োর দেখেন, পাহাড়ের আলোতে সে এক অপরূপ দেশ। ইতিহাসের ওপারের ইতিহাস যেন এখানেই জমাট বেঁধে আছে। বিংশ শতাব্দীকে সেই প্রাক্ ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে অত্যন্ত বিস্বাদ মনে হবে। হৃদয়ের সঙ্গে বর্তমান সভ্যতার কোন যোগ নেই। কিন্তু সাঁওতাল ছেলে যখন মাদল বাজায়, বাঁশীতে সুর তোলে, তখন হৃদয়ে কী যে অব্যক্ত মধুরের ছায়া পড়ে সে-কথা বলে বোঝানো যায় না। সভ্যতাকে তখন অসভ্যতা বলেই মনে হয়। সাঁওতাল বস্তিতে কয়দিন মনের আনন্দে ঘুরলাম। মহুয়া গাছের ছায়ায়, শালের পাতার আড়ালে তেন্দু গাছের ভিড়ে, নাম না জানা ঝোপঝাড়ে যেন কৃত্তিবাসের রামায়ণ গান গেয়ে যায়। একদিন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বড় চমক লাগল। বড় বড় দুটো সাপ মেরে নিয়ে আসছে সাঁওতাল ছেলেরা। তীর দিয়েই মেরেছে। তাদের আনন্দ আর ধরে না, যেন বিষাক্ত কোন ক্ষতিকর জীবের তারা প্রাণহানি করেনি, বীর বিক্রমে শিকার নিয়ে ফিরছে। যথার্থই শিকার। সাপ তাদের সুস্বাদু ভক্ষ্য। সাপ, ছোট ইদুর, খরগোশ, শূয়োর, নীলগাই, এমনকি বাঘ. কার মাংস তারা না খায়! আমি সেই বড় বড় সাপ দুটোকে নেতিয়ে পড়া অবস্থায় দেখে ভাবছিলাম—সাপের অধ্যাত্মতা নিয়ে এতদিন ধরে আমি যে মাথা ঘামিয়েছি—কী অবলীলাক্রমে সাঁওতালেরা তাকে অস্বীকার করতে পেরেছে! যে সাপ অমৃতলোকে নিয়ে যেতে পারে সে নিজেই এদের কাছে মৃত। অরণ্যের অমৃত ছায়ায় নির্ভেজাল প্রকৃতিতে যারা বাস করে তাদের বোধহয় শহরের মত অমৃত-সন্ধানে প্রয়োজন নেই। শহর হল বিষ। সাপের বিষের মত বিষ দিয়েই বিষক্ষয় করতে হয়। অমৃতের জগতে গরলের কোন আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নেই।

সুখসেনার উত্তর দিকে রাজমহলের পাহাড়ের যে উদ্‌বৃত্ত অংশ গঙ্গার উপর ঝুঁকে পড়েছে তার নাম টিক্কর। রেল লাইন এই টিক্করের পশ্চিম পাশে পাহাড়ের গায়ে খাদ কেটে সাহেবগঞ্জের দিকে এগিয়ে গেছে। এর কিছু উত্তরেই সকরিগোলি ঘাট। ওপারে মণিহারি ঘাটের বালুর চর। টিক্করের প্রাকৃতিক দৃশ্য যথার্থই অতুলনীয়। ছোটবেলায় বহুবার এখানে এসেছি রঙিন নুড়ি কুড়াতে। একদিন হাঁটতে হাঁটতে সেখানে এসে উপস্থিত হলাম। টিক্করের এক অংশ এখন পাথর কোয়ারী হয়েছে। কিন্তু তাতেও গঙ্গা বিধৌত এ অঞ্চলের সৌন্দর্য এতটুকুও নষ্ট হয়নি। উত্তরদিকে কলকোলাহল, দক্ষিণদিকে গঙ্গার বুকে ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের পিঠে স্বর্গের অম্লান হাসি। কয়েকটি মহুয়া আর শালের চাড়ার ছায়া আছে সেখানে. কিন্তু ঘন অরণ্যের অন্ধকার নেই। আকাশের আলো মহুয়া আর শালপাতার ছায়ার সঙ্গে আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা করে। গঙ্গার বুকে প্রতিবিম্বিত সূর্যও আলো দেয়। একদিন সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে একমনে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। পতিতপাবনী গঙ্গা। কত কাহিনী তাঁর সঙ্গে জড়িত। কাহিনীর সত্যতা আধুনিক মন বিশ্বাস করতে চায় না। তবু ছোটবেলার বিশ্বাসের ভিত রয়েছে হয়তো অচেতন মনের স্তরে। তাই বিজ্ঞানের বিশ্লেষণকে এড়িয়েও গঙ্গাকে অব্যক্ত রহস্যময়ী মনে হয়। খেয়াল করিনি, গৈরিক ঘাসের রঙের সঙ্গে মিশে ছিল একটা বড় সাপ। নানারকম চক্র কাটা গায়ে। যেন শিবের বাহু জড়ানো সেই উদয়ন নাগের মত। আমার সাড়া পেয়ে নড়ে উঠল। নিষ্পলক চোখে আমাকে একটু যেন তাকিয়ে দেখল। তারপর ঘাসবনের মধ্যে এঁকে বেঁকে কোথায় দূরে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। খুব চেনা সাপ। ছোটবেলা গঙ্গার বালুচরে অনেক পড়ে থাকতে দেখেছি। লোকে বলে চন্দ্রবোড়া। এই চন্দ্রবোড়া সাপ একবার ঠাকুরঘরের দরজার উপর থেকে আমার মাথায় আঘাত করেছিল, দাঁত ফোটাতে পারেনি। সাধনমার্গে এর নাকি বিরাট তাৎপর্য আছে। বালির সাধক জ্যোতিষী ননীগোপাল ভট্টাচার্য আমাকে সে-কথাই বলেছিলেন। বহুদিন পরে

আবার সেই চন্দ্রবোড়া সাপ দেখে আমার হৃদয়ের মধ্যে কেমন ব্যাথ্যার অতীত একটা রহস্য মোচড় দিয়ে উঠল। আমি একমনে সেই সাপটির দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখছিলাম। সাপটার পালিয়ে যাবার ব্যস্ততা নেই। নিরুদ্বেগ চলে যাওয়ার ছন্দ। দেখছিলাম। যতদূর দৃষ্টি যায় দেখছিলাম। এমন সময় পিছনে মরা পাতার উপর কিসের শব্দ পেলাম যেন। অবুঝ হরিণ শিশু যেন ঠিক এমনি করেই মরা পাতার বুকে এসে দাঁড়ায়। পাহাড়ে কত অসংখ্য জীব আছে কে বলতে পারে! কে এসে দাঁড়াল কে জানে! আমি পিছনে ফিরে তাকালাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা এক মহিলা। মাথার সামনে শিবের ঝুঁটির মত একটি ঝুঁটি বাঁধা। চুল রুক্ষ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বাঁ হাতে ত্রিশূল। ডান বগলে ছোট একটি ঝোলা। দুই বাহুতে রুদ্রাক্ষের বলয়। হাতের কব্জিতেও বলয় আছে। বয়স কত অনুমান করা যায় না। তবে মুখে কোন ভাঁজ নেই, নিটোল মুখ। স্বাস্থ্যের প্রচুর দীপ্তি। রঙ গৌরবর্ণ। সে এমন করে আমার দিকে তাকাল যে, আমি কেমন দিশেহারা বোধ করলাম। সে চোখের দৃষ্টি যেন আমার অন্তস্তলের অতলান্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাঁর দেহে যৌবনের প্লাবন আছে বটে, কণ্ঠে নারীত্বের কমনীয়তা নেই। সে আমায় প্রশ্ন করল: তুমি বাঙালী?

প্রথমটা উত্তর দিতে পারলাম না। অপরিচিতা কোন মহিলার সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস নেই বলেই বোধহয়।

সে বলল, কি গো, কথা বলছ না যে?

বললাম, হ্যাঁ!

—এখানে দাঁড়িয়ে কেন? তুমিও কি কামেখ্যে যাবে নাকি?

ভৈরবী হঠাৎ কামাখ্যার প্রশ্ন করল কেন? ভাবলাম, জায়গাটা সকরিগোলি ঘাটের খুব কাছেই। অনেক আসামযাত্রী এ-পথে এই ঘাট পেরিয়ে ওপারে মণিহারি যায়। সেখান থেকে কাটিহার গিয়ে আসাম যাবার গাড়ি ধরে। ছোটবেলা রোজ সকরিগোলি ঘাটে এসে

আসাম যাত্রীদের দেখতাম। রেল যাত্রীদের গায়ে কেমন যেন সুদূরের গন্ধ থাকে। তাদের ব্যস্ততার মধ্যে কোন্ বহুদূর জগতের হাতছানি থাকে যেন। এ-পথে যেমন ভদ্র, ধোপদুরস্ত ও সাহেব মানুষ দেখেছি, তেমনই এই ধরনের আসাম যাত্রী অনেক তন্ত্রসাধক সাধিকাকেও লক্ষ্য করেছি। তন্ত্রপথের পথিকরাই আসামে যেত বেশী। যেত ভৈরব ও ভৈরবী। ছোটবেলা তন্ত্রের স্বরূপ বিন্দুমাত্র জানতাম না। এখন কিছুটা বুঝবার চেষ্টা করি। বুঝতে পারলাম, কামাখ্যাযাত্রিণী ইনি কোন ভৈরবী। ভৈরব ভৈরবীদের অধিকাংশই নিম্ন জাতের মানুষ বলে শুনেছি। ঝাড়ফুঁক তুক্‌তাক এদের মধ্যেই অদ্যাবধি টিকে আছে। এ ভৈরবী কোন্ শ্রেণীর কে জানে।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে ভৈরবী বলল, কি গো, বোবা নাকি? কথার জবাব দিচ্ছ না যে! শুনতে পাও না?

কণ্ঠটা যেন কেমন। বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে ওঠে। ভৈরবীর রূপে আকর্ষণ থাকলেও কণ্ঠে কেমন একটা ঠেলে দেওয়ার ভাব। সংক্ষেপে জবাব দিলাম: —না।

—এখানে তবে কেন?

—এমনি।

—এমনি! তা একমনে কি তাকিয়ে দেখছিলে গো চাঁদ?

কথা বলার ধরনের মধ্যে কোন রুচি নেই। সে-জন্য ভাল লাগল না একটুও। জবাব দিলাম না সে প্রশ্নের।

ভৈরবী বলল, চন্দ্রবোড়া সাপটাকে দেখছিলে না কি গো একমনে?

বললাম, হ্যাঁ।

—কেন? সাপের নেশায় ধরেছে নাকি তোমাকে?

'সাপের নেশা!' কী বলতে চায় ভৈরবী! আমি তার চোখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলাম। তার চোখের দৃষ্টির মধ্যে কেমন একটা ভয়ানক ভাব যেন। ইস্পাতের মত দৃষ্টি? না, তা নয়। যেন সাপের জিব লক্‌লক্ করছে সেই চোখের মধ্যে। ভৈরবী বলল, আ মলো, চোখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? নেশা ধরেছে নাকি চাঁদমুখের?

আমি চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম গঙ্গার দিকে।

ভৈরবী দেখি কাছে এসে দাঁড়াল, প্রায় গায় গা ঘেঁষে।

চটুল বেদেনীদের মত হাবভাব, কথা ব'লে, হাস্যেলাস্যে লোক ঠকানো যাদের পেশা। ভৈরব ভৈরবীরাও এমন করে লোক ঠকায় জানি। তাদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা কতদূর আছে জানি না, তবে অনেকেরই সম্মোহনী ক্ষমতা আছে। অভিচার ক্রিয়া করে তারা লোককে বশীভূত করে, তারপর তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করে। এ ভৈরবীর কি ইচ্ছা কে জানে! আমি একটু সরে যাবার চেষ্টা করলাম।

ভৈরবী হেসে বলল, সাপ খুঁজছিস, সরে গেলে চলবে কেনরে? লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।

কি বলতে চায় ভৈরবী! আমি আবার তার চোখের দিকে তাকালাম। সে ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠল। বলল, সাপ খুঁজে বেড়াচ্ছিস তো? তাই না?

চমকে গেলাম। 'সাপ খুঁজে বেড়াচ্ছি' বলতে সে কি বোঝাতে চায়? তাহলে আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা কি সে জানতে পেরেছে? ভেকধারী ভৈরবী নয়? যথার্থ ই ভৈরবী? মানুষের অন্তরাত্মা দেখতে পায়?

ভৈরবী বলল, কিরে, কথা বলছিস না কেন? সাপ খুঁজছিস তো?

বললুম, হ্যাঁ।

ভৈরবী বলল, সাপ কি খুঁজলেই পাওয়া যায় রে! সাপ খুঁজবার জন্য যে কাজের দরকার তা করতে পারিস?

—কি কাজ! আমি আবার তার মুখের দিয়ে তাকালাম। সে এগিয়ে এসে আমার চিবুকটা একটু ছুঁলো। অদ্ভুত উত্তাপ তার আঙুলের ডগায়। আঙুল কর্কশ নয়, নিতান্তই কোমল। স্পর্শে আমার মধ্যে কেমন একটা শিহরণ জাগল। এই শিহরণের মধ্যে ছিল সম্ভবত কিছুটা ভয়, কিছুটা ঘৃণা আর কিছুটা তম্বী রমণীর

প্রতি দুর্বলতা। আমার এই দিশেহারা ভাবটা সে অনুভব করতে পারল কিনা জানি না, কিন্তু একটু যেন পর্যবেক্ষণ করে আমাকে দেখল, তারপর বলল, বুঝেছি, সত্যি সত্যি সাপের নেশাতেই ধরেছে। তা বাপু, সাপ যদি ধরতে চাও, আরও ঘুরতে হবে, আরও জানতে-হবে।

বললাম, এ সাপকে কি ধরা যায় ?

সে বলল, যায় না আবার! তবে লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।

কি একটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম। সে বলল, বুঝেছি, বুঝেছি, অনেক কিছুই জানতে চাও। জানাবো গো, জানাবো। তার আগে বাপু আমার পুঁটুলিটা একটু পাহারা দাও দেখি। আমি গঙ্গা থেকে একটা ডুব দিয়ে আসি।

আর কোন কথা না বলে, পুঁটুলিটা আমার কাছে নামিয়ে রেখে, ভৈরবী তর্‌তর্‌ করে গঙ্গার দিকে এগিয়ে গেল। এখানে কোথা দিয়ে সে গঙ্গায় নামবে ভেবে পেলাম না। একটুও চাতাল নেই। পাহাড়ের কোল কেটে গঙ্গা বয়ে চলেছে ছলাৎ ছলাৎ। ভৈরবী পাহাড়ের উদ্‌বৃত্ত অংশটার একেবারে কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর সেখান থেকে যেন গঙ্গার বুকে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি বেশ বিস্ময় বোধ করলাম। কিন্তু সেই বিস্ময়ের ভাব আমার কমে গেল যখন দুধচটির অলকনন্দার তীব্র স্রোতে পাহাড়ের অনেক উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আমার বর্তমান গ্রন্থের প্রথম পর্বে উল্লেখিত সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তন্ত্রপথে যাঁরা সাধনা করেন তাঁরা অনেকেই এমন অলৌকিক কিছু শক্তি সঞ্চয় করে থাকেন। আমার মনে হল ভৈরবী তন্ত্রপথে বেশ কিছুদূর এগিয়েছে। সর্পরহস্যের গূঢ়তত্ত্ব, এও হয়তো জানে। বেশ আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

অনেকক্ষণ পরে ভৈরবী উঠে এল। তৈলচিত্রে সিক্তবসনা তন্বী যুবতীর মত মনে হচ্ছে তাকে। উত্তুঙ্গ স্তনযুগলের হেম আভা গৈরিক বস্ত্র ভেদ করেও যেন ফুটে বেরুচ্ছে। ফোটা ফোটা রুপোলি

বিন্দু ঝরছে জটা থেকে, যেন মুক্তাপাতি। নাভিদেশের ভাঁজ পর্যন্ত দেখা যায়। ভৈরবী বিদ্যুৎভরা দুই চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি স্বাভাবিক লজ্জায় মাথা নিচু করে নিলাম।

ভৈরবী আমার পুরুষত্বকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে তার বস্ত্র পরিবর্তন করল। ভেজা কাপড়খানা পাহাড়ী ঘাসের উপর টান টান করে মেলে দিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোন্ সম্প্রদায়ের গো ?

ভাবলাম ভৈরবী আমার জাত গোত্র জানতে চাচ্ছে। বললাম, কায়স্থ সম্প্রদায়ের।

ভৈরবী হোহো করে হেসে উঠল, তারপর বলল, সাপ খুঁজতে বেরিয়েছ, এখনও বামুন কায়েতের ভেদ গেল না। আমি সে সম্প্রদায়ের কথা বলিনি গো ?

—তবে ?

ভৈরবী বলল, বুঝেছি, এখনও অতদূর এগোতে পারনি। তবে সাপকে জানতে চাইলে এগুতে হবে। আচ্ছা রোস, তোমার আসল কথাটি কি, একটু বুঝে নি'। ভৈরবী যেন ধ্যানে বসল, এমনভাব করে আসনে বসে একটু নিস্তব্ধ হল। তা দেখে আমার লোভাতুর মন ভেতর থেকে লাফিয়ে উঠতে লাগল। ভাবল, অলৌকিকের ছোঁয়া পাওয়া যাবে। আমি কৌতূহলে ভৈরবীর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

কিছুক্ষণ পরে ভৈরবী চোখ মেলে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ যথার্থই সাপ খুঁজছ।

বললাম, এ সাপকে পাওয়া যাবে কি করে ?

—তন্ত্র কর্, যন্ত্র কর্, সাপ পাবি।

—সে আবার কি ?

ভৈরবী বলল, সেই তো আসল পথ।

বললাম, তন্ত্র করলে কি হয় ? যারা তান্ত্রিক তারা কী পান ?

ভৈরবী বলল, যাঁরা যা উদ্দেশ্য নিয়ে সাধনা করেন তাঁরা তাই পান। আসলে তন্ত্রধর্মে যেটা বীরাচার তার মূল উদ্দেশ্য পাশমুক্ত

হওয়া। কারণ জীব দুঃখ পায় পাশবদ্ধ অবস্থাতেই। পাশমুক্ত হলেই জীব নিজশক্তি অর্থাৎ আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়। কিন্তু সেই শক্তি যদি সে নিজের ভোগে লাগায় তাহলেই মহাবিপাক। যদি জগতের কল্যাণে লাগায় তাহলে দেবত্ব লাভ।

বললাম, সাপ কি ? লোকে সাপের সাধনা করে কেন ?

ভৈরবী বলল, সাপই তো ভগবানের সন্ধান দেয়।

বললাম, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ইতিহাস পড়ে তো কোথাও সাপের এত মহত্ত্ব খুঁজে পাচ্ছি না।

হোহো করে হেসে উঠল ভৈরবী। বলল, ইতিহাস দিয়ে ইতিহাসের উপরের জিনিস ধরতে চাস ? কাঠের মই দিয়ে স্বর্গে যাবার ইচ্ছে ! কি বোকা রে তুই।

বললাম, ইতিহাসে যদি সত্যের সন্ধান না করি, তবে কোথায় করব ?

—সত্যের সন্ধানের জন্য যে পথ বাতলানো আছে সে পথে গেলেই সত্যের সন্ধান পাবি।

—কী সে পথ ?

—বললাম তো তন্ত্রের পথ।

—তন্ত্র তো কিছু কিছু পড়েছি। কিন্তু কিছু তো পেলাম না ?

ভৈরবী হেসে বলল, তন্ত্র কি পড়বার জিনিস। তন্ত্র করবার জিনিস। বিয়ে করে বৌ ঘরে আনলেই কি সন্তান হয় ? বৌ-এর সঙ্গে সহবাস করতে হয় তবে সন্তান হয়। তন্ত্রের ফল পেতে হলে তন্ত্রের সহবাস দরকার। ভৈরব হও, ভৈরবী সহবাস কর তবেই শক্তির সন্ধান পাবে। শক্তিই নিয়ে যাবে ভগবানের কাছে।

বললাম, বিবাহ করেছি, গৃহিণী আছে, ভৈরবীর দরকার কি ?

ভৈরবী বলল, লেখাপড়া করে খুব বুদ্ধিমান হয়েছ নাকি গো। বিয়ে করে কেউ যদি জাহান্নামে যেতে চায় তবে সে কোথায় যায় ? বেশ্যার কাছে। স্বর্গে যেতে চাইলে যেতে হয় ভৈরবীর কাছে এ কথা বুঝতে পার না ! স্ত্রী যখন স্ত্রী থাকে তখন শক্তি জাগে

না। যখন ভৈরবী হয় তখন শক্তির জাগরণে সাহায্য করে। তোমার যা লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, তোমার হবে। উঠে পড়ে লেগে যাও, ভগবতী সহায় হয়ে সিদ্ধি এনে দেবে। আগে শক্তিমান হও। তোমার মধ্যে কতটা শক্তি আছে তা জান, তার সৎ ব্যবহার কর, তখন ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝবে। আগে শক্তিমান হও, বুঝেছ? বাজে তর্কই শিখেছ। তর্ক দিয়ে ভগবান লাভ হয় না। এই জন্যই শিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে ভগবান দূরে থাকে।

কথা বলতে বলতে ভৈরবী কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যেন। অপ্রয়োজনে যেন মুহূর্তের মধ্যে আগুনের মত জ্বলে উঠল। হঠাৎ তার রেগে যাবার কারণ আমি বুঝতে পারলাম না। ভৈরবী হঠাৎ যেন গালাগালই করতে আরম্ভ করে দিল—যত সব চ্যাংড়া ছোঁড়া, ইস্কুল কলেজে দু'পাতা ইংরেজী পড়ে তর্ক করতে শিখেছে। জানোয়ারের বাচ্ছা সব, জানোয়ার।

ভৈরবীর হঠাৎ এত রাগ দেখে আমি কেমন যেন বোকা বনে গেলাম। সহসা আর কোন কথা বলতে পারলাম না। ভৈরবী আপন মনেই বিড়বিড় করে বলল, 'বীর্যহীন, মেধাহীন জানোয়ারের জাত। পরের মাগের দিকে চোখ দেবে, আবার সমাজে সাধুপুরুষ সাজবে। আপিসে সাহেবের লাথি খাবে আবার ঘরে এসে মাগ ছেলের উপর ঝাল ঝাড়বে! দূর্ দূর্।' রক্তচক্ষু করে ভৈরবী আমার দিকে তাকাল। তারপর তর্জনী তুলে বলল, খবরদার আমার সঙ্গে তর্ক কোর না।

আমার মুখে কোন কথা থাকল না। কখন তর্ক করলাম আমি মনেই আনতে পারলাম না। আমি শুধু দু'একটা কথা জানবার চেষ্টা করছিলাম বৈ নয়। কি দোষ করলাম কে জানে। ভৈরবী দেখলাম আমার কাছ থেকে হন্‌হন্ করে দূরে সরে গেল। ঘাসের উপর যে ভিজে কাপড়টা মেলে দিয়েছিল তা গুটিয়ে নিল। তারপর যেন এক্ষুনি চলে যাবে এমন ভাব করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার শক্তি জানো! আমি ইচ্ছে করলে তোমার সর্বনাশ করতে পারি, জান।

মনে মনে ভাবলাম মেয়েটি বোধহয় পাগল। এর সঙ্গে বাক্যালাপ না করাই ভাল। যেই না চিন্তা করা, অমনি দেখি ভৈরবী ফোঁস করে উঠেছে : কি! আমি পাগল! আরে মুখপোড়া তোর সর্বনাশ হবে যেরে!

আমি যথার্থই ভয় পেলাম। ভৈরবী মনের কথাও সহজে ধরতে পারে বেশ বুঝতে পারলাম। সে যে সামান্য আর দশজন মেয়ের মত নয় এটা বুঝতে অসুবিধা হল না। কিন্তু তার রহস্য ভেদ করার মত সাধ্য আমার নেই। অগত্যা বোকার মত আমিই সরে যাবার চেষ্টা করলাম। ভৈরবী হঠাৎ খপ করে আমার ডান হাতের কব্জিখানা চেপে ধরল। বলল, 'পালাবি কোথায়? তোর সাধ্য আছে আমার কাছ থেকে পালাস? তোর মত লোককে পোকা বলে মনে করি জানিস তো? উ! ঘরে মাগ রেখে সাপের সন্ধানে বেরিয়েছে। বংশ বৃদ্ধি করতে পারে নি এখনও, ধ্বজভঙ্গ কোথাকার, উনি খুঁজছেন সাপ!' আশ্চর্য শক্তি ভৈরবীর। আমার যে সন্তান নেই সে কথাও জানে দেখছি। কিন্তু অকস্মাৎ আমার উপর এই রাগের কারণ কি বুঝতে পারলাম না। তার স্পর্শে কেমন একটা অদ্ভুত উত্তাপ আছে, সেটা আমাকে যেন বিহ্বল করে দিল। আমার অবচেতন মনে একটা শঙ্কা ধড়াস্ ধড়াস্ করে কাঁপতে লাগল। আমি হতবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। ভৈরবী বলল, ভোগ করলে তবে যোগ হয়। যা যা ঘরে গিয়ে মাগকে উপভোগ কর্ আগে, তারপর সাপের খোঁজ করবি। তোর বীর্যের মধ্যে সাপ আছে তা জানিস না! সেই সাপটাকে টিপে মারছিস, বাইরে আবার সাপ খুঁজছিস। ঢং! ছাই পাবি, ছাই। সাপের সন্ধান পাবি না ছাই পাবি।

আমি সত্যিই ভয় পেয়ে মাথা নিচু করলাম। পালাতে পারলে যেন বাঁচি। কিন্তু তার বজ্রমুষ্টি এড়িয়ে যে ছুটে যাব সে ক্ষমতা নেই। ভৈরবী বলল, যোগ নিয়ে তন্ত্র নিয়ে যে ঘাঁটাঘাঁটি করিস, সত্যি করে বল্ সংসারে তোর বিরাগ এসেছে? আমি তোকে ছুঁয়ে আছি, নিজের ভেতরটা দেখে বল।

মুহূর্তের মধ্যে অন্তস্তলের একটি গোপন পর্দা আমার স্থূল বাসনা কামনার রেখা হয়ে যেন খুলে গেল। বুঝলুম বৈরাগ্য মোটেই জন্মায় নি। বাসনা কামনা রীতিমত জলজ্যান্ত। সর্পিণীর কৌতূহল আমার বৈজ্ঞানিক মনের কৌতূহল মাত্র। ভৈরবীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেকটা নরম্ হয়ে এসেছে। চোখের আগুন ক্রমশঃ স্নিগ্ধ হচ্ছে। আমার সঙ্গে চোখে চোখে হতেই সে একটু হাসল—তবে!

আমার চোখে বোধহয় পাপবোধ ফুটে উঠল। তা দেখে ভৈরবী বলল, তাতে ভয় কিরে। শিব পরম গতি। পাপী তাপীকে উদ্ধার করার জন্যই তিনি এই তন্ত্র দিয়েছেন। এতে ভোগের মধ্য দিয়েই যোগে যাওয়া যায়। বামনাদের মত ঢং নেই। ঘোমটার আড়ালে খেমটার নাচ নেই। বল্, সত্যি সত্যিই সাপের সন্ধান চাস? শক্তির সন্ধান চাস?

বললাম, এই মন নিয়ে আর সেই সাপের সন্ধান পাওয়া যাবে?

ভৈরবী বলল, কেন পাওয়া যাবে না! শক্তিকে আগে খুশি কর। ঘরের কর্তাদের কাছে যেতে হলে আগে গিন্নীকে খুশি করতে হয় জানিস না!

বললাম, শক্তিকে খুশি করব কি ভাবে?

ভৈরবী নিজের বুকের উপর আমার হাতখানা রাখল। যেন প্রচণ্ড একটা সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গে নাচছে সেখানে। বাইরের সঙ্কোচ আর অবচেতনার আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে একটা ঘূর্ণিঝড় তৈরী করল যেন। আমি দিশেহারা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে ভৈরবী তার ব্যাকুল চিত্তের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে এমন কথা বলল যে, বর্তমান গ্রন্থে তা লেখার যথার্থ ক্ষমতা আমার নেই। আমার লৌকিক ও সামাজিক রীতিনীতিতে গাঁথা মন কিছুতেই তা ব্যক্ত করতে সাহস পাবে না। আমার ভেতরটা রীতিমত কাঁপতে লাগল। আমি হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলাম।

ভৈরবী বলল, তুই আমায় কি ভেবেছিস বল্‌তো? রাক্ষসী না পিশাচী? না আর কিছু? অমন করে কাঁপছিস কেন?

তাতে আমার কাঁপুনি আরও বাড়ল বই কমল না। হঠাৎ ভৈরবী যেন সেই আগের মত জ্বলে উঠল, দূর্ দূর্, কাপুরুষ! মেনিমুখো ব্যাটা ছেলে। দূর্ দূর্ দূর্। তারপর গলায় হাত দিয়ে পেছনে ঠেলে দিয়ে বলল, যা যা গলায় দড়ি কল্‌সী বেঁধে গঙ্গায় ডুব দিগে যা। সে যেন আমাকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিল। তারপর ভিজে কাপড় পুঁটলি ভরে নিয়ে হন্‌হন্ করে পাহাড়ের চাতাল বেয়ে নিচে নেমে গেল। মুহূর্তের মধ্যে যে কোথায় গেল তা আর হদিস করতে পারলাম না।

ভৈরবী চলে গেলে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। কোথায় যেন এ-রকম একটা কাহিনী পড়েছিলাম। তা মনে করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। তারপর এই অদ্ভুত হেঁয়ালির অর্থ খুঁজবার চেষ্টা করলাম। ইতিহাসে দেখা যায় ভৈরবীরা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয় এবং কুলাচার অবলম্বন করে মদ্যমাংস ইত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহার করে থাকে। এরা গেরুয়া পরে। বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করে এবং ললাটে সিঁদুর লেপন করে। এদের হাতে থাকে ত্রিশূল। দেশের নানাস্থানে ঘুরে বেড়ায়। এরা ভৈরবীচক্র ও তন্ত্রোক্ত কুলচক্রে প্রবেশ করে এবং বীরাচারী পুরুষদের সঙ্গে একত্র উপবেশন করে সর্বপ্রকারে কুলাচারের অনুষ্ঠান করে। কলকাতার কালীঘাটে এবং ভারতের অন্যান্য শাক্তপীঠে এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কালীঘাট, কামরূপ ও জ্বালামুখীতে এককালে এদের প্রচুর ভিড় ছিল। জ্বালামুখীর ভৈরবী মাতঙ্গী মায়ী এক সময় ভারতবিখ্যাত ছিলেন। কাশীতেও এক সময় এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত। ইতিহাসেই উল্লেখ আছে যে এদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত কামাসক্ত ও ইন্দ্রিয় সুখে অনুরক্ত। অনেকেই স্বেচ্ছাচারীর মত ব্যবহার করে। কোন কোন ভৈরবী সঙ্গে একটি করে ভৈরবও রাখে। তাকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায়।

বীরাচারী তান্ত্রিকরা মধ্যে মধ্যে চক্র করে দেবদেবীর সাধনা করে। তন্ত্রের স্ত্রীচক্রে ভৈরবীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ভৈরবেরা চক্রাকারে শ্রেণীক্রমে আপন আপন শক্তির সঙ্গে কপালে

চন্দন মেখে যুগল ক্রমে ভৈরব ভৈরবী ভাবে উপবেশন করে। মধ্যখানে কোন ভৈরবীকে সাক্ষাৎ কালী মনে করে মদ্যমাংস দিয়ে তার অর্চনা করা হয়। কি ধরনের স্ত্রীলোক এই চক্রের মধ্যমণি ভৈরবী হতে পারবে 'গুপ্তসাধনতন্ত্রে' তারও উল্লেখ আছে, যেমন,

নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা॥
মালাকারস্য কন্যা চ নবকন্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
বিশেষবৈদগ্ধযুতা সর্বাএব কুলাঙ্গনা॥
রূপযৌবনসম্পন্না শীলসৌভাগ্যশালিনী।
পূজনীয়া প্রযত্নেন ততঃ সিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥

সুতরাং যৌন সম্ভোগ তন্ত্রে অননুমোদিত নয়। এটাকে এরা অর্থাৎ ভৈরবীরা অন্যায় বলে মনে করে না বরং তাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভের একটি উপায় বলে মনে করে। মদ্যপানও এদের মতে পাপের কিছু নয়। চক্রে বসে যে পর্যন্ত দৃষ্টি চঞ্চল ও মন বিচলিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এদের পান করবার নির্দেশ আছে।

কুলকার্যের অনুষ্ঠানে এমন ঘটনা ঘটে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে চোখে দেখা দূরস্থান কল্পনা করলেও বিবমিষার উদ্রেক হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে তার যে জঘন্য বর্ণনা আছে তা কি করে যে হাতে লেখা যায় বর্তমান অশ্লীল সাহিত্যের লেখকেরাও তা কল্পনা করতে পারবেন না। এ-সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনার দুটো লাইন মনে পড়তে আমি নিজেই যেন চমকে উঠলাম। যেমন,

'মুখে সংপূর্য মদিরাং পায়য়ন্তি স্ত্রিয়ঃ পুমান্।
উপদংশং মুখে ক্ষিপ্তা নিক্ষিপন্তি প্রিয়াননে॥'

এইমাত্র যে ভৈরবী আমার মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে চলে গেল তাকে এই বীরাচারী তান্ত্রিকদের ভৈরবী বলে মনে হল আমার। এ ধরনের যৌনচর্চার মাধ্যমে সাধনায় কী অর্জন করা যেতে পারে আমার মাথায় কিছুতেই যেন তা এল না।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকের ধারণা এ হল শরীরের

অপ্রয়োজনীয় ক্লেদ সিঞ্চন করে ফেলে দেওয়ার একটা কৌশল মাত্র। কারো কারো মতে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া থেকে এ ধরনের সাধন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল। তখন সাধকেরা প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থাকে এইভাবে আঘাত করে আনন্দ পেতেন। তবে এদের বীভৎসতা সম্পর্কে নানা ধরনের যে-সব গল্প শোনা যায় তাতে এদের যথার্থ সাধক বলে ভাবা সত্যিই দুষ্কর। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গে' এদের চক্রের এক বিবমিষা উদ্রেককারী বর্ণনা আছে। বর্ণনা দিয়েছেন তিনি বক্রেশ্বরের ভৈরবের সাধনপ্রসঙ্গ বর্ণনা-ক্রমে। 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে যে বর্ণনা আছে বর্ণনাটা মনে পড়তে লাগল আমার।

বক্রেশ্বরের অঘোরীবাবা সাধারণতঃ শ্মশানে একাই থাকতেন। কোন ভৈরবী তাঁর সঙ্গে থাকত না। তবে মহেশ্বরী মায়ী নামে পূর্ববঙ্গ থেকে একজন ভৈরবী ক্বচিৎ কদাচিৎ সেখানে আসতেন। তাঁকে এবং অঘোরীবাবাকে ঘিরে তন্ত্রসাধকদের চক্রসাধনা হত। আরো অনেক ভৈরব ভৈরবী এসে জড় হতেন। চক্রাকারে পঞ্চ-ম-কারের উপাচার নিয়ে তাঁরা বসতেন। রীতিমত মদ্যপান হত। তাঁরা প্রথমে কারণ শোধন করে মূল ভৈরব অঘোরীবাবা এবং মূল ভৈরবী মহেশ্বরী মায়ীকে তা নিবেদন করতেন। একটি কপালপাত্রে এই কারণ অঘোরী-বাবার মুখের কাছে ধরা হত। তিনি সেই পাত্র হাতে নিয়ে প্রথম ধরতেন ভৈরবী মহেশ্বরী মায়ীর মুখে। মায়ী তাতে ওষ্ঠ স্পর্শ করাবার পর অঘোরীবাবা সেই কারণ পান করতেন। অঘোরীবাবা ও মহেশ্বরী মায়ী দু'জনেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকতেন। মহেশ্বরী মায়ী উলঙ্গ অবস্থাতেই অঘোরীবাবার কোলে বসে থাকতেন। এই অবস্থায় যুগল মূর্তি হবার আগে উলঙ্গ মহেশ্বরী মায়ীর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অঘোরীবাবা পুজো করে নিতেন। মূল ভৈরব ভৈরবীর পূজা হবার পর চক্রে বৃত্তাকারে চতুর্দিকে বসা ভৈরবরাও তাঁদের উলঙ্গ ভৈরবীর সর্বাঙ্গ পুজো করতেন। তারপর যে যাঁর ভৈরবীকে কারণ পান করিয়ে সেই পাত্র নিজের মুখে তুলে নিতেন। তারপর আকণ্ঠ মদ্যপানের উৎসব চলত। মদ্য মাংসাদিও আহার করা

হোত। তারপর চলত রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অদ্ভুত এক সাধনা। তবে সকলেই যে স্থির থাকতে পারত তা নয়। অনেকের মধ্যে পার্থিব চাঞ্চল্যও আসত। শুধু অতিলৌকিক যুগল হরগৌরীর মূর্তির মত মধ্যখানে বসে থাকতেন অঘোরীবাবা ও মহেশ্বরী মায়ী। দুটি দেহ দুটি আত্মা যেন এক হয়ে যেত। এই একাত্মতার মধ্যেই নাকি শক্তি সাধনার চূড়ান্ত সার্থকতা। কামাখ্যার পিশাচসিদ্ধের সম্পর্কেও এমন কাহিনী শোনা গেছে। তাঁদের মিথুন মূর্তি নাকি যথার্থই দৃষ্টির আড়ালে চলে যেত। এর মধ্যে যে কি দুর্ভেদ্য রহস্য লুকিয়ে আছে কে বলবে। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে এ তন্ত্ররহস্যের মর্ম ভেদ করা অসম্ভব। বিবমিষা উদ্রেককারী অনেক ঘটনাও এর মধ্যে ঘটে। যেমন মূল ভৈরব ভৈরবীর সঙ্গমের ফলে কোন রেতঃ বাইরে পড়লে চক্রের বৃত্তাকারে অবস্থানকারীরা সেই রেতঃ তুলে নিয়ে সকলেই প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করেন। এমন বীভৎস দৃশ্য সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্পনা করাই দুঃসাধ্য। গয়াতীর্থে বে-শরম ভৈরব ভৈরবীর কথাও 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। জনৈক বাঙালী তীর্থপুণ্যপ্রয়াসী গয়াতীর্থে উলঙ্গ অঘোর অঘোরীকে সবার সামনেই পয়সার লোভে যৌনক্রিয়া করতে দেখেছিলেন। কোন ধর্ম এ ধরনের জিনিস অনুমোদন করতে পারে ভাবা যায় না। অথচ প্রাচীনকাল থেকেই তো ভারতবর্ষে এরকম ঘটে আসছে কতকাল!

এ ধরনের তন্ত্রে ঈশ্বর লাভ হয় কি না আমার নিজের সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এইসব তন্ত্রপথের পথিকেরা অস্বাভাবিক কিছু ক্ষমতা অর্জন করে থাকেন প্রায় সকলেই। যৌনচর্চার মধ্য দিয়ে যে কিভাবে এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা অর্জন করা যায় অন্ততঃ আমার সাধারণ বুদ্ধিতে তা আসে না। অথচ এরা ভাল না হোক নানারকম অভিচারক্রিয়া যেমন, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ ইত্যাদিতে ওস্তাদ। কেমন করে এটা সম্ভব হয়! এ-সব নিম্নস্তরের ক্রিয়া বলে নিম্নস্তরের সাধনা করেই আয়ত্ত করতে হয় এ-ক্ষমতা? আশ্চর্য! আমি টিক্করের পাহাড়ে ভৈরবীর কণ্ঠে যে ধরনের যৌন সঙ্গমের

জন্য আবেদন শুনলাম—তা বারবণিতার পক্ষেই স্বাভাবিক। অথচ অদ্ভুত এক শক্তি তার আয়ত্তে। মনের চিন্তার তরঙ্গকে তৎক্ষণাৎ সে পাঠ করতে পারে। নইলে আমার কয়েকটি মনের কথাকে তৎক্ষণাৎ সে কি করে বলে দিতে পারল! তন্ত্রের এই অধ্যায়ের রহস্য সত্যি সত্যি ভাবনায় ফেলে দেবার মত। এর কি যথার্থ কোনই তাৎপর্য নেই? একটা মিথ্যাই কি যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে চলে আসছে! তাই যদি হয় তাহলে সেই মিথ্যার জন্যই ইউরোপ পর্যন্ত আজ এমন করে কেন ভারতীয় ও তিব্বতীয় তন্ত্রের খোঁজ করছে। অধিবস্তুবাদী আন্দ্রেঁ ব্রেতোঁ তাঁর কুড়ি বৎসরের সাহিত্য সাধনাকে শেষ পর্যন্ত তন্ত্রের পায়েই ঠেলে দিয়ে বলেছেন, পরম মুক্তি পাওয়া যেতে পারে তন্ত্রের দেশ ভারত এবং তিব্বতেই। এই যদি তন্ত্রের লক্ষণ হয় তা হলে মহা-মুক্তির স্বাদ এর মধ্য দিয়ে কি করে পাওয়া যেতে পারে? বৈদান্তিক সাধনার ধারা যে তাহলে সম্পূর্ণই নস্যাৎ হয়ে যায়। কোথায় এর সুস্থ ব্যাখ্যা আছে কে জানে!

তন্ত্রপথের অনেক সৌম্য সাধক বলেন—এ এক দুস্তর কঠিন সাধনা বটে, তবে অত্যন্ত চমৎকার সাধনা। যৌন উপকরণ তন্ত্র সাধনায় সাধকের সামনে রাখা হয় বটে তবে তা এই আবেদনকে অস্বীকার করবার জন্য। তিনিই বীর যিনি সামনে পার্থিব বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে আবেদনের বিষয়কে অনায়াসে অতিক্রম করে পরমানন্দের সন্ধান করতে পারেন। এইজন্য তন্ত্রসাধনার এই পথটাকে বীরাচারী বলে আখ্যা দেওয়া হয়। প্রচণ্ড বীর হলে তবেই সে অনায়াসে ইন্দ্রিয়ের এই প্রলোভনকে জয় করতে পারে, নির্বিকার চিত্তে মাতৃ কল্পনায় রমণী নারীর যোনিদেশকে মাতৃ-অঙ্গ হিসেবে পুজো করতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু নিধন করে যিনি যুদ্ধ জয় করেন তিনি বড় বীর নন, রিপু জয় করে যিনি দাঁড়াতে পারেন তিনিই যথার্থ বীর। এইজন্য রিপুজয়ী জৈন ধর্মগুরু বর্ধমান 'মহাবীর' নামে খ্যাত। মহাবীর রিপুজয়ী বলেই নির্বিবাদে উলঙ্গ থাকতে পারতেন। বালক বালিকারাও তো উলঙ্গ হয়ে নিসঙ্কোচে ঘুরে বেড়ায়। তাদের যৌন অঙ্গ যৌন অঙ্গের প্রতীক নয়। যথার্থ সাধক হলে বালক স্বভাবের হতে হয়।

অনেকে তন্ত্র-সাধনায় পঞ্চ-মকারের সাধনার একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। যেমন, কুলার্ণবতন্ত্রে এ সম্পর্কে এ-রকম একটা ভাষ্য আছে: যে কারণবারি চিত্তকে উৎফুল্ল করে তা হল কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহস্রারস্থ শিবের সঙ্গে মিলনজাত অমৃত। যিনি এই মিলনজাত অমৃত পান করেছেন তিনিই জানেন সুরাপানের যথার্থ অর্থ, নইলে সুরাপান যথার্থ ই সুরাপান। যিনি জ্ঞানখড়্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণাগুণকে হত্যা করতে পারেন তিনিই 'কেবল বলি দেওয়া পশুর মাংস খেয়ে শিবত্ব প্রাপ্ত হতে পারেন, নইলে মাংস ভক্ষণই সার। যিনি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে মনকে আত্মনের মধ্যে স্থাপন করতে পারেন তিনিই যথার্থ মৎস্য ভক্ষণ করেন নইলে মৎস্য ভক্ষণ যথার্থ ই মৎস্য ভক্ষণ। এইভাবে পঞ্চ-মকারের প্রত্যেকটি পঞ্চতত্ত্বের একটি করে প্রতীক অর্থ আছে।

আশ্চর্য! তাই যদি হয় তাহলে বক্রেশ্বরের অঘোরীবাবাকে কেন্দ্র করে এমন চক্র বসত কেন? লোকে কামাখ্যার পিশাচসিদ্ধের যৌন সঙ্গমের মধ্যে অতীন্দ্রিয় শূন্যতা লক্ষ্য করবে কেন? আমার সামনে থেকে এইমাত্র যে ভৈরবী চলে গেল সেই বা আমার কাছে অমন করে যৌন উপভোগের প্রস্তাব রাখবে কেন? না, ভৈরবী আমাকে শুধু পরীক্ষা করে গেল? সাধারণের কাছে যৌন সঙ্গম যে অর্থে দেখা দেয়, তান্ত্রিকদের কাছে সে অর্থে দেখা দেয় না?

তন্ত্রসাধনা করেছেন, অথচ মৈথুন চর্চা করেন নি এমন বড় সাধকের কথাও তো শোনা যায়! বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন কি? স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও কি মৈথুন বাদ দিয়ে তন্ত্রসাধনা করেন নি! তবে এ বিষয়ে তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যাও আছে। তাঁরা বলেন তন্ত্র মতে তিনভাবে সাধনা করা যায়—পশু, বীর ও দিব্য। পশুভাবের তান্ত্রিকদের মধ্যে থাকে কাম ক্রোধের আধিক্য। তাঁদের কর্তব্য সব-রকম প্রলোভন থেকে দূরে থেকে ভগবানের নাম জপ ও পুরশ্চরণাদিতে রত থাকা। বীর ভাবের সাধকদের বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁদের মধ্যে কাম ক্রোধের চেয়ে ঈশ্বর অনুরাগ প্রবল। কামকাঞ্চন রূপরসের আকর্ষণ তাঁদের হৃদয়ে ভগবতপ্রীতি আরও বেশী করে বাড়িয়ে তোলে। তারাই

কামকাঞ্চনাদি প্রলোভনের মধ্যে বাস করে—অবিচলিত চিত্তে ভগবানে মনপ্রাণ সমর্পণ করতে চেষ্টা করে। আর যাঁদের মধ্যে ভগবদ্‌প্রীতির বন্যায় কাম ক্রোধ ইত্যাদি চিরকালের মত ভেসে গেছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত ক্ষমা, দয়া, তোষ ইত্যাদি সদ্‌গুণ সহজ হয়ে উঠেছে তাঁরাই দিব্যভাবের সাধক। তাহলে যৌন ক্রিয়াকারী যে-সব তান্ত্রিক সাধকের কথা শোনা যায় তাঁরা কি বীরভাবের সাধক? এইমাত্র যে ভৈরবীর দেখা পেলাম আমি তিনিও বীরভাবের সাধিকা? আমি তাকে না বুঝতে পেরে তাড়িয়ে দিলাম। শুনেছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে ভৈরবীর কাছে তন্ত্রমতে দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনিও বীরভাবের সাধিকা ছিলেন। তাহলে আমি কি অবহেলায় কোন সর্প সাধিকার সংস্পর্শ হারালাম! ব্রাহ্মণী ভৈরবী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকেও তো মধ্য রাতে পূর্ণ বয়সী যুবতী নারীকে তন্ত্রমতে পুজো করিয়েছিলেন! তাকে দেবী জ্ঞান করতে শিখিয়েছিলেন! সেই পূর্ণ যুবতীর কোলে পরমহংস দেবকেও বসিয়েছিলেন! অঘোরপন্থীদের মত গলিত শবের মাংস রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকেও তো মুখে নিতে হয়েছিল। সবকিছুকেই শিব মনে করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন সেই মাংস মুখে দিয়েছিলেন তখন গলিত মাংসে তিনি অমৃতের স্বাদ পেয়েছিলেন। যৌনতা অযৌনতা সবই মনের গঠনের উপর নির্ভর করে। শিশু মানুষের কোন বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেই স্বতন্ত্র মূল্য দেয় না। মাতৃস্তনকে সে অমৃত নির্ঝরিণী বলে মনে করে। পাপবোধ জন্মালে বয়স্ক মানুষের চোখে রমণী নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তখন বিশেষ মূল্য, বিশেষ অর্থ ধরা পড়ে। রমণীর যোনিদেশকে কেউ দেখে মাতৃত্বের প্রতীক, জন্মের দুয়ার, আবার কেউ দেখে কামনার ইন্ধন হিসেবে। একই মন দুই যোনিকে দু'রকম দেখতে পারে। শিবলিঙ্গ ও মাতৃযোনিকে যে-লোক দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করে সেই আবার চিত্রে রমণী নারীর যোনি প্রদেশ দেখলে কামোন্মাদনা অনুভব করে। মনকে যে-ভাবে ভাবানো যায় সে-ভাবেই সে ভাবে। আমি হয়তো ভৈরবীকে ভুল বুঝে তাড়িয়ে দিলাম। কিংবা আমার দুর্বলতার দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে ভৈরবী চলে গেলেন? তিনি কি

আমাকে বুঝিয়ে গেলেন যে, সর্পিণীর সন্ধানের জন্য যে প্রস্তুতির দরকার সে প্রস্তুতি আমার হয়নি ! সর্পিণী এখনও দূর-অস্ত ! সাধকরা তো প্রতীকেই কথা বলেন, সরাসরি বলেন না। রাজা বাসকাল যখন বহ্ব ঋষিকে ব্রহ্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঋষি তার কোন জবাব দেননি। তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর রাজা যখন বললেন, আমি তিনবার আপনার কাছে ব্রহ্মস্বরূপ জানতে চাইলাম, কিন্তু আপনি কোন কথা বললেন না কেন ঋষি ? ঋষি তখন বললেন, 'আমি আপনার কথার জবাব দিয়েছি রাজা, আপনি বুঝতে পারেননি। শান্তো ইয়ম আত্মা। আত্মা হল পরম শান্ত। নীরব থেকে আমি সেই কথাটাই আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।' আমার কাছে যৌন আবেদন রেখে ভৈরবী আমাকে কী বোঝাতে চেয়েছিল কে জানে ! হয়তো সর্পিণী রহস্য হাতের কাছে এসেও আবার দূরে সরে গেল।

চার

সুখসেনাতেই আছি। প্রকৃতি এখানে সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় অপরূপ। পূবে তাকালে দেখি পতিতপাবনী গঙ্গা, পশ্চিমে তাকালে দেখি রাজমহল পাহাড়। সকালে রাখালদের গোচারণে যেতে দেখি। দুপুরে সাঁওতালদের বাঁশী শুনি, সন্ধ্যায় ধূলি উড়িয়ে গরুর পাল ফিরে আসে, গোধূলি দেখা দেয়। কখনও কখনও ময়ূরের কেকা আওয়াজ শুনতে পাই। পাহাড় আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। রোজই পাহাড়ের কোলে বেড়াতে যাই। পাহাড়ের গায়ে একটা ধূসর ইতিহাসের গন্ধ আছে, আমাকে কেমন তা পাগল করে তোলে। রাজমহল পাহাড়ের অনাড়ম্বর অরণ্যে আমি অতীন্দ্রিয়ের স্বাদ নেবার চেষ্টা করি। ভাবি, এই নির্জনতায় কোন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধকের যদি দেখা পাই !

অনাবিল প্রকৃতি দেখছি, ইচ্ছা দিয়ে রঙ তৈরি করে আকাঙ্ক্ষিত সাধকের কথা ভাবছি, একদিন এমন সময় একদা আমার জেঠামণির

চাকর মহাবীর এসে খবর দিল—সকরিগোলি পাহাড়ের প'হারী বাবার গুহার কাছে এক সাধু এসেছেন, দেখতে যাবি নাকি চল্। সাধুর গলায় নাকি সব সময় একটা সাপ ঝোলানো থাকে। তাঁর ছাইমাখা সর্বাঙ্গ নাকি হাড়ের মালায় ভর্তি। বুকের কাছে আছে একটা বড় নরকরোটি। নরকরোটিটি হাড়ের মালায় লকেটের মত।

মহাবীরের কাছে সাধুর বর্ণনা শুনে আমার বড় কৌতূহল হল। বিশেষ করে তাঁর গলায় একটা সাপ জড়ানো থাকে বলে কৌতূহলকে আর চাপতে পারলাম না। অবচেতন মন আমাকে ঠেলতে লাগল এই আকাঙ্ক্ষাতে যে, সর্পরহস্যের কোন সন্ধান হয়তো এঁর কাছে পাওয়া যেতে পারে।

আমি যেখানটায় থাকি সেখান থেকে প্রায় মাইল দুয়েক এগিয়ে গেলে সকরিগোলি। সুখসেনাতে রাজমহল পাহাড় যে বাঁক নিয়েছে সে বাঁকটা অনেকটা ধনুকের মত। দক্ষিণে এই বাঁকের একটা অংশ কিছুটা চাতাল হয়ে নেমে গঙ্গার জল ছুঁয়েছে, উত্তরে বাঁকের আর একটা অংশ চাতাল হয়ে নেমে এসে পতিতপাবনী গঙ্গাকে স্পর্শ করেছে। উত্তরের পূর্বমুখী বাঁকের চাতাল অংশকেই বলে টিক্কর। একটা ছোটখাটো পাথর কোয়ারীও বসেছে এই চাতালের সর্বশেষ উত্তর অংশে। উত্তর দক্ষিণে এই দুই চাতালকে সরলরেখায় ছুঁয়ে আছে উত্তরপূর্ব রেলপথের লপ লাইন। এই রেললাইনের আরও পব দিকে দুশ গজ দূরে পুরোনো রেল লাইন বুকের হাড়পাঁজরা বের করে আছে। তারই উপর গড়ে উঠেছে অধুনা একটা বস্তি। পুরোনো রেল লাইনের গা ঘেঁষে একটা পায়দলের পথ চলে গেছে উত্তর দিকে। এই রেললাইন পরিত্যক্ত হয়েছিল গঙ্গার প্রবল স্রোতে এর মধ্যে ভাঙন ধরেছিল বলে। সুখসেনার সর্বোত্তর অংশ থেকে টিক্করের চাতাল-টিলা পর্যন্ত অংশটুকু গঙ্গার আক্রমণেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেই জন্যই রেললাইন আরও পশ্চিমে সরে গিয়ে টিক্করের চাতালের কিছু অংশের পাঁজর কেটে উত্তরে বেরিয়ে গেছে। পাহাড়ের দুই চাতালে গঙ্গার গতি বাধা পায় বলে অর্ধবৃত্ত পাহাড়ের

পেটের মধ্যে যে সমতলভূমি তাকে গঙ্গা আর গ্রাস করতে এগিয়ে আসতে পারে না। শৃঙ্খলাবদ্ধপদ হস্তীর মত সামান্য কিছু এগিয়ে মাটির উপর একটু সুর বুলিয়ে যায় এই যা। গঙ্গা কখনও বা এগিয়ে এসে পুরোনো রেললাইন পর্যন্ত খাদ সৃষ্টি করে, আবার কখনও বা মাইলের পর মাইল চড়া সৃষ্টি করে পূবে বাংলাদেশের তটরেখা গ্রাস করে সরে যায়। ছোটবেলা গঙ্গার এ ভাঙাগড়ার খেলা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। সে যাই হোক, পুরোনো রেললাইনের নিচে যে পয়দলের পথ সেই পথ দিয়ে মহাবীরকে সঙ্গে নিয়ে সকরিগোলির দিকে এগিয়ে গেলাম।

ছোটবেলা বহুবার এই পথে সকরিগোলির দিকে গিয়েছি। তখন জেঠামশাই সঙ্গে থাকতেন। তিনি ছিলেন এখানকার জমিদারী এস্টেটের নায়েব। সাধারণতঃ বয়েল গাড়ি করে অর্থাৎ গরুতে টানা গাড়ি করে তিনি যেতেন। বয়েল গাড়ির প্রবল ঝাকুনি তারুণ্য ও যৌবনের পক্ষে অসহ্য। আমরা তাই গাড়ির আগে আগেই হেঁটে যেতাম।

বাবলা বনের ছায়া দিয়ে ঘেরা সেই পয়দলের পথে আমি আর মহাবীর দুপুরবেলা সকরিগোলির দিকে পা বাড়ালাম। রেললাইন যেখানে একদা গঙ্গার প্রবল স্রোতে উড়ে গিয়েছে সেখানে এখন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চাষবাস। ইতস্ততঃ মাঝে মাঝে বাবলা গাছ। সময়টা হেমন্ত কাল। রবি ফসলের দিন। রোদ্দুরে ক্লান্ত বিবর্ণ হলুদাভা। উত্তর থেকে কিছু কিছু হিম জড়ানো হাওয়া আসছে। শৈশবের স্মৃতির কথা স্মরণ করতে করতে এ-পথ দিয়ে হাঁটছিলাম। হেমন্তের মুখে পাহাড়ী ঘাসগুলি শুকোতে আরম্ভ করেছে। সবুজ পাহাড় ক্রমশঃ গৈরিক বসন পরছে। পাহাড়ের গৈরিকতার মধ্যে আশ্চর্য এক উদাসীন আহ্বান থাকে।

হাঁটছিলাম, হঠাৎ মহাবীর আমাকে নাম ধরে ডাকল। মহাবীর এক সময় আমার জেঠামশাইয়ের রাঁধুনী হিসেবে কাজ করলেও আমাদের চেয়ে বয়সে বড়। ছোটবেলায় আমাদের নাম ধরে ডাকতো। সেই অভ্যেস আজও আছে। সেই নামেই ডাকে। মহাবীর ডাকল : নিগূঢ় দেখ।

—কি ? আমি মহাবীরের মুখের দিকে তাকালাম।

মহাবীর একটা বাবলা গাছের গোড়ায় হাতের আঙুল দিয়ে ইশারা করল। আমি তাকিয়ে দেখলাম ভয়ানক কালো এক প্রকাণ্ড সাপ। ছোটবেলায় সাপের মধ্যে মানুষ হয়েছি, বহু সাপ দেখেছি, সুতরাং সাপ চিনি। বুঝলাম এ হল ভয়ানক বিষাক্ত জাতসাপ। সাক্ষাৎ মৃত্যু। দংশন করলে কোন রকমেই অব্যাহতি নেই। বেনারস ডি এল ডব্লিউ কোয়ার্টার্স থেকে ঘোড়ার গাড়িতে স্টেশনে আসবার সময় এই রকমই এক ভয়ানক সাপ দেখেছিলাম রাস্তার বাঁ পাশে। সেই সাপটার কথা মনে পড়ে গেল। শীতের দিনে সাধারণতঃ সাপ বাইরে দেখা যায় না। এ সাপটা যে কেন গর্ত থেকে বাইরে এসেছে, কে জানে ! বোধহয় রোদ পোহাচ্ছে।

আমরা যে পথ দিয়ে যাব, একেবারে সেই পথের ধারেই এই মৃত্যুর ছায়া। মহাবীরকে বললাম, চল একটু ঘুরে যাই। ওর ধার কাছ দিয়ে গেলে তেড়ে এলেই বিপদ। জাতসাপ সামান্য একটু শব্দ পেলেই ফোঁস করে ওঠে।

দেখলাম জাতসাপের ভয় মহাবীরেরও আছে। সাপটাকে বাঁ হাতে একটু তফাত রেখে সে মাঠের মধ্য দিয়ে এগুতে লাগল। এগুতে এগুতে আমি ভাবলাম, সাপ বাঁ হাতে করে কোন কাজে এগুলে কি হয় ! যাত্রাকালে সাপ ডান দিকে না বাঁ দিকে থাকলে ভাল হয় কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। যা ভয়াবহ, সাক্ষাৎ মৃত্যু, তাই আবার মঙ্গলেরও প্রতীক। মানুষের এ ধরনের বিশ্বাসের কোন সত্যতা আছে কিনা মনে মনে তাই বিশ্লেষণ করে জানবার চেষ্টা করলাম।

সাপটাকে একটু ছাড়িয়ে গেলেই ঝর্ণাধারায় কাটা সামান্য একটা খাদ। সেই খাদ পেরিয়ে ওপারে টিক্কর। টিক্করের কোয়ারীতে কিছু পাথর ভাঙার শব্দ পাওয়া গেল। পাহাড়ের চাতালে যেখানটায় রহস্যময় ভৈরবীকে দেখেছিলাম সে জায়গাটা আর একবার তাকিয়ে দেখলাম।

টিক্কর ছাড়ালেই পাহাড়টা পশ্চিম দিকে বেশ খানিকটা বাঁক নিয়েছে। শস্যক্ষেত্র এখানে বহুদূর বিস্তৃত। পূব দিকে অবশ্য গঙ্গার স্রোত রুদ্রমূর্তি। তাল তাল মাটি কেটে গভীর খাদ সৃষ্টি করে উত্তর দিকে বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। কিছুদূরেই সকরিগোলির ঘাট-স্টেশনের চালা দেখা যায়। দু-একটা স্টীমার গাধাবোটের গায়ে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো ওধার থেকে যাত্রীদের এপার এনে এখন বিশ্রাম করছে। এপারের স্টীমার ওপার চলে গিয়ে ধুঁয়া ছাড়ছে। বিকেলের ঘাটগাড়ি এই স্টেশনে এলে জায়গাটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠবে। ছোটবেলা যাত্রী-চঞ্চল কর্মব্যস্ত ঘাটের রূপ আমি দেখেছি।

উত্তর দিক থেকে শীতে তাড়ানো অগ্রবর্তী হাওয়া দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছে। নাক বরাবর উত্তরে রাজমহল পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন একখণ্ড টিলা। টিলার চূড়ায় একটা পীরের সমাধি। ছোটবেলায় শুনতুম হুমায়ুনের কবর। শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধের সময় হুমায়ুন নাকি ঘোড়া শুদ্ধ এই টিলা থেকেই গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ছোটবেলা যা বিশ্বাস করতাম বড় হয়ে তা বিশ্বাস করি না। ইতিহাস সে বিশ্বাসে প্রায়শই সহায়তা করে না। এই পাহাড়ের গোড়ার দিকে একটা বড় খাদ ও সুড়ঙ্গ আছে। সুড়ঙ্গপথে নাকি গঙ্গায় নেমে যাওয়া যায়। লোকপ্রবাদ বঙ্গদেশের দ্বার এটা। বঙ্গদেশের দ্বার হল দ্বারবঙ্গ, এখন যাকে বলে দ্বারভাঙ্গা। সুতরাং ঐ সুড়ঙ্গ সম্পর্কিত কিংবদন্তীও সত্য নয়।

অনেক কিছুই এখানে সত্য নয়। তবে সকরিগোলির এই বিচ্ছিন্ন উত্তর অংশে যে কয়েকটি সাধুর আস্তানা আছে, পাহাড় কাটা প'হারী বাবার গুহা আছে, বাঙালী সাধুর মঠ আছে, মঠের সামনে সিংহমুখো দরজা আছে—তা কখনই অসত্য নয়।

সামনে স্মৃতি এবং তার অস্তিত্ব। সে টানছে। স্টীমার ঘাট ডাইনে রেখে আমরা সকরিগোলি পাহাড়ের দিকে বাঁ দিকে বাঁক নিলাম। এ অঞ্চলটাতে কেন যেন রহস্যময় জগতের গন্ধ আছে।

এ গন্ধ ছোটবেলা তীব্রভাবে পেতাম, এখনও পাই। মঠের সেই বাঙালী সাধু এখনও আছেন কিনা জানি না। আমি যখন তাঁকে ছোটবেলায় দেখেছি তখন তিনি বৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের মত দীর্ঘশ্মশ্রু। তবে মাথায় কুণ্ডলীপাকানো জটা। রুপোর ফ্রেমে মোড়া চশমা পরতেন। চোখে গোলাপ'জল দিতেন। যে-কেউই মঠে যাক না কেন, তাকে দুটো লুচি আর একটু হালুয়া প্রসাদ দিতেন। সন্ন্যাসী বেশে কিছু শিষ্য ও শিষ্যাও ছিল। সেদিকে এগুতে এগুতে ছোটবেলার স্মৃতির আঁচল ধরে টানতে লাগলাম।

আমার ছোটবেলাতেই প'হারী বাবার গুহাতে কেউ থাকত না। শুধু গুহার মধ্যে তাঁর বিছানার পাশে কিছু সুগন্ধি ধূপ জ্বলত। বিছানার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত নিত্য ছড়িয়ে দেওয়া কিছু ফুল। সযত্নে একটা মালাও বিছিয়ে দেওয়া থাকত। সেই প'হারী বাবার গুহার সামনে এসেছে এক সর্প সাধক ; তাঁর গলায় জড়ানো থাকে সাপ যেমন শিবের গলায় থাকে মহানাগ উদয়ন তেমান। তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে এগুতে লাগলাম। দূর থেকেই দেখা গেল অনেক লোক পাহাড়ের চাতাল বেয়ে নিচে নামছে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে সেই আশ্চয সর্পভূষণ সাধুকে দেখবার জন্যই সকলে এখানে ভিড় করেছিল। শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত শহরেই যদি বিজ্ঞাপনমার্কা সাধু সন্ত দেখার জন্য ভিড় হয় তাহলে মূর্খ ও দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামবাসী কোন আশ্চর্য সাধু সন্ন্যাসীর খোঁজ পেলে তাঁকে দেখতে জমায়েত সৃষ্টি করবে না কেন। অতীন্দ্রিয় শক্তির করুণা পাবার জন্য শিক্ষিত থেকে মূর্খ কোনো লোকেরই দুর্বলতার অন্ত নেই। লোকের সমাগম দেখে সেই সর্পসাধক সম্পর্কে আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল।

সকরিগোলির পাহাড়ের যে অংশে এক সময় বেশ কিছু সাধুসন্তের বাস ছিল ছোটবেলায় দেখেছি সে অংশটার বেশ যত্ন ছিল। দশ বিশ বৎসর পরেই দেখছি সেখানে যত্নের অভাব নেমে এসেছে। সেই পরিচ্ছন্ন পরিবেশ আর নেই। পাহাড়ে উঠে প্রথমেই গেলাম প'হারী বাবার গুহায়। সেখানেও অযত্নের চিহ্ন। তবে কয়েকদিন

ধরে লোক সমাগম হচ্ছে মনে হয়। বোধহয় এই সাপে জড়ানো নতুন সন্ন্যাসীকে দেখবার জন্যই সাধারণ মানুষ যাতায়াত করছে। কলকাতার রাস্তাতেও এক ধরনের ভস্ম গায়ে মাখা সন্ন্যাসী দেখেছি। তাঁদের গলায় এক ধরনের সাপ জড়ানো। সে সাপগুলো দেখতে অনেকটা কুচোর মত। রঙও সেই ধরনের। কিন্তু এ-সাধুর গলায় শুনেছি যথার্থই বিষাক্ত সাপ, ফণা তুলে। সাপুড়েরাও ফণা তোলা সাপ নিয়ে খেলা দেখায়। তাদের বিষ দাঁত থাকে না। এ সাপ কি ধরনের কে জানে! অধিকাংশ সময়ই এ-সবকে আমার ভান মনে হয়। এইজন্য গুরুদের আমি ঘৃণা করি। গৈরিক ও রক্তবস্ত্র পরিহিত লোকদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা কম! পুরোহিতদের আমি ভলতেয়ারের মতই **imposter** বা প্রতারক বলে ভাব। তবে অবিশ্বাস্যের সংমিশ্রণ ঘটলে একটা কৌতূহল সৃষ্টি হয় সন্দেহ নেই। মানুষ ও সাপের পরস্পর অবস্থান প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম, সেইজন্যই আমার আগ্রহ। তা ছাড়া টিক্করে দেখা ভৈরবীও আমাকে একটু চমকে দিয়েছে। যে-কোন বিদ্যাই হোক এদের আয়ত্তে আছে, যে বিদ্যা আমাদের জানা নেই, যে বিদ্যার সাহায্যে মানুষের দুরধিগম্য মনে অনায়াসে তারা প্রবেশ করতে পারে। আমাদের জানা তো বাইরের জানা, ভেতরের জানা কতদূর। বাহ্যতঃ অশিক্ষিতা ভৈরবীও এমন কয়েকটি কথা বলেছে, তুলনা দিয়েছে, যা সাধারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও অনায়াসে দিতে পারেন না। সুতরাং কোথায় যে কি আছে, কে বলবে। তা ছাড়া সর্প সম্পর্কিত একটা অনুসন্ধিৎসা অনবরত আমার মধ্যে কাজ করে চলেছে। সুতরাং আমাকে সেই প্রবল কৌতূহলই ঠেলে নিয়ে চলল।

প'হারী বাবার গুহার মুখেই সেই সন্ন্যাসী বসে আছে। গায়ে ভস্ম মাখানো, মাথায় রুক্ষ জটা, রুক্ষ শ্মশ্রু গুম্ফ, শরীরের কিছু অংশে বিষ্ঠা জাতীয় কিছু মাখা রয়েছে মনে হল। গৈরিক বা রক্তবস্ত্র কোন বস্ত্রই পরা নেই। সাধু উলঙ্গ, গলায় হাড়ের মালা, মালার মধ্যে লকেটের মত একটা করোটি। পাশে করোটিরই কমণ্ডলু। কিছু হাড় ছড়িয়ে

ছড়িয়ে রয়েছে পাশে। দু-একটার গায়ে সামান্য কিছু মাংসও লেগে রয়েছে, কিছু কিছু দুর্গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। এত ভয়াবহ চেহারা যে কি বলব! চোখ তাকিয়ে আছে বটে, তবে আত্মস্থ। বাইরে অন্য কোথাও দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না। একজন দেহাতী লোক মহাবীরকে চিনত, সে এগিয়ে এসে বলল, নদীর ধারে একটা মড়া পড়েছিল। তার পা ছিঁড়ে এনে খেয়েছে। সে-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে কেমন বিবমিষার উদ্রেক হল। একটা পচা গন্ধ পাচ্ছিলাম সেটা যেন আরও বেশী করে পেলাম।

দেহাতী লোকটি মহাবীরকে বলল, পিশাচসিদ্ধ, তুক তাক জানে। শুনেছি রাতে জ্যান্ত লোকের ঘাড় মট্‌কে খায়।

সাধুর চেহারার দিকে তাকালে এ ধরনের প্রচারে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। মহাবীরের চোখে মুখে দেখলাম ভয়ের চিহ্ন। কেউ বলল, 'রেগে গেলে সাপটাকে ছেড়ে দেয়। কয়েকজন লোককে নাকি সাপটা জড়িয়ে ধরেছিল।' সাপটার ভয়ে লোকে সাধুর খুব কাছে এগুচ্ছে না। সাধুসন্তের কাছ থেকে অলৌকিক সাহায্য পাবার আশা ত্যাগ করে দূর থেকে তাঁকে দেখেই চলে যাচ্ছে। সাপটাকে আমিও দেখলাম। মাঝে মাঝে সাধুর জটায় ফাঁক খুঁজে মুখ লুকাবার চেষ্টা করছে। আবার মাঝে মাঝেই যেন চমকে গিয়ে ফণা তুলে ফোঁসফোঁস করে উঠছে। যেন রীতিমত একটা শিক্ষা পাওয়া সাপ। শিক্ষাপ্রাপ্ত নানা জন্তু-জানোয়ারের কথা শুনেছি কিন্তু **trained** কোন সাপের কথা আমি আগে শুনিনি। এমন শিক্ষাপ্রাপ্ত সাপ আগে দেখিনিও।

মহাবীরকে মনে হল সে কিছুটা ভয় পেয়েছে। আমাকে বলল, নিগূঢ়, চল্ এখানে থেকে কাজ নেই।

আমি বললাম, কেন?

সে বলল, শুনেছি জ্যান্ত লোক ধরেও খায়।

মহাবীর রীতিমত পালোয়ান। আমার দেহের গঠন তেমন নয়। তথাপি জলজ্যান্ত দুটো লোককে একটা পিশাচসিদ্ধ ধরে গিলে ফেলবে এতটা বিশ্বাস আমার নেই। অবশ্য ওদের তুকতাক করার ক্ষমতায়

আমার অবিশ্বাস নেই। সাধুটির মাথার সাপ আমার কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। সাপ দেখে স্পষ্ট চিনতে পারলাম গোখরো সাপ। এই সাপ কোন্ প্রতীক হিসেবে সাধুর সঙ্গে কাজ করছে, সেটাই আমার জানবার ইচ্ছে। মহাবীরকে ঠেলে নিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলাম। মহাবীর যেন যথার্থ ই ভয় পেয়েছে। খুব একটা কাছে এগিয়ে যেতে সে সাহস পেল না. তার অজ্ঞতা ও কুসংস্কারও যে তার এই ভীতির মূলে কাজ করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার মতো অদ্ভুত এক কৌতূহল তো তার মধ্যে নেই! খুব একটা কাছে মহাবীর তবু এগুলো না, বিশেষ করে সাপের ছোবল থেকে একটা নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে বসল। বসল অবশ্য হাত জোড় করে, ভক্তিভাবে।

আমি মহাবীরকে বললাম, মহাবীর, সাধুর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

মহাবীর বলল, কি পুছ্‌বার পুছ্‌ না!

সাধু এতক্ষণ চোখ মেলে থাকলেও আত্মস্থ ছিলেন। আমার কথা শুনে মনে হল দৃষ্টি বাইরে পাঠালেন। কৌতূহলে চোখের মণি দুটো নড়ে উঠল। তারপর যথার্থ ই তাকাল। তাকানোর ভঙ্গীটা সাদা বাংলায় বলা যায় কটমট করে তাকানো। মহাবীরকে মনে হল, সত্যিই ভয় পেয়েছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, পুছ্‌ না কি পুছ্‌বি?

সন্ন্যাসীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। দৃষ্টি ভয়াবহ, যেন মর্মভেদ করে যায়, আমার ভেতরটাও একটু নড়ে উঠল।

আমি বললাম, মহারাজ আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের?

সন্ন্যাসীর চেহারা দেখে মনে হয়েছিল—অবাঙালী। কিন্তু কথা বললেই স্পষ্ট বুঝলাম বাঙালী। বোধহয় নিম্নবর্ণের হিন্দু। প্রথম একটা শব্দ করে উঠল—ব্যোম!

কাছাকাছি দু-একটা লোক যারা ছিল তারা সে শব্দে একটু দূরে সরে গেল। সন্ন্যাসী এবার মুখ তুলল। বলল, সম্প্রদায়ে তোর দরকার কি? তুই তো আর সম্প্রদায় জানতে আসিস নি

বললাম, আমি কি জানতে এসেছি, আপনি জানেন ?

সামান্য একটু হেসে সাধু বলল, সাপটা তোর কৌতূহল সৃষ্টি করেছে, তাই না ?

আমার কৌতূহল সম্পর্কে তিনি যথার্থ অনুমান করতে পেরেছেন সন্দেহ নেই। এ-ধরনের সাধুদের দেখলাম এই একটা বিশেষ ক্ষমতা তাঁদের সবারই আছে। ভৈরবীর মধ্যেও এই ক্ষমতা দেখেছিলাম। আমি তাই সাপ সম্পর্কেই প্রথম প্রশ্ন তুললাম। বললাম, আপনি সঙ্গে করে এই সাপটিকে রেখেছেন কেন ?

সন্ন্যাসী বলল, সাপ সঙ্গে রাখব না তো কি একটা অপদার্থ মানুষকে সঙ্গে রাখব। সাপের জন্যই তো ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি।

—কেন ?

—সাপ না হলে যাঁকে খুঁজছি তাঁকে পাব কোথায় ?

—কাকে খুঁজছেন ?

—সাধু সন্ন্যাসীরা যাকে খুঁজেন, সেই পরমার্থকে ।

—সাপ সেই পরমার্থের সন্ধান দিতে পারে ?

—নিশ্চয়ই।

—বাইরের এই সাপ ?

—সাপ বাইরেও যা ভেতরেও তাই।

—তার মানে ?

সন্ন্যাসী বলল, তার মানে নিজে বুঝে নে। নিজেই তো বুঝবার চেষ্টা করছিস, পুঁথিপত্তর ঘাঁটছিস।

—কিন্তু পুঁথিপত্রে তো কোন হদিস পাচ্ছি না !

হাসতে হাসতে সাধু বলল. তাহলে বল্, লেখাপড়া জানা লোকেরা হার স্বীকার করেছে ?

বললাম, আমার জ্ঞানে যা কুলোয় তাতে তাই মনে হয়।

সন্ন্যাসী আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখল কে জানে। একটু মনস্থির করে বলল, আগে সাপের গোড়ার কথা জান্ তারপর সাপের খোঁজ করিস। আরো অনেক কাঠখড় পুড়াতে হবে রে।

—কেন ?

—সময় না হলে কেউ কিছু পায় ?

—আমার কি সময় হয়নি ?

—হয়েছেও, আবার হয়ওনি।

—অর্থাৎ !

—অর্থাৎ জানবার কৌতূহল হয়েছে। জানবার পর যখন বুঝবি, বুঝবার পর যখন কসরৎ করবি, তখন পাবি।

আবার সে আমার দিকে তাকাল। তাকিয়ে কি একটু দেখলো। বলল, সাপের অর্থ তো একটু বুঝেছিস, তাহলে বাইরে এই সাপকে খুঁজছিস কেন ?

—অর্থাৎ !

—আর বলব না, যেভাবে এগিয়ে চলেছিস এগিয়ে যা। ভৈরবী তো সাপের সন্ধান দিতে চেয়েছিল নিলি না কেন ?

আমি অবাক হয়ে সেই সাধুর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। হোঃ হোঃ করে সন্ন্যাসী বিকটভাবে হেসে উঠল। বলল, ভৈরবী ভুল করেছিল। ভৈরবীর যে সর্পসন্ধান তোর নয়। তোকে যে সর্পের সন্ধান দেবে সে আসছে।

—'হ্যাঁ!' আমার কৌতূহল প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে উঠল: আরও কিছু শোনার জন্য আমি আগ্রহে সন্ন্যাসীর দিকে তাকালাম।

সন্ন্যাসী আপন মনেই একটু হেসে নিয়ে বলল, যা, যা, এবার ঘরে যা, আর কথা নয়।

কিন্তু আমার মনে তখন অজস্র কৌতূহল ভিড় করে উঠেছিল। আবার বললাম, আরো দু'একটা প্রশ্ন ছিল।

কোন জবাব পেলাম না।

আবার প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা…।

কিন্তু সন্ন্যাসী যেন আত্মস্থ হয়ে থাকল। আমার কথার কোন জবাব দিল না।

আরো বোধহয় একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সন্ন্যাসীর

মাথার উপর সেই সাপটি প্রকাণ্ড একটা ফণা তুলে ফোঁস করে উঠল। এমন ভয়ানকভাবে সাপটা শব্দ করে উঠল যে, আমি পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেলাম। মহাবীর তাড়াতাড়ি আমাকে ঠেলে দিল, চল্, আভি ঘর চল্।

কে একজন বলল, হ্যাঁ, আর বাতচিৎ করবেন না। অনিচ্ছাকৃত-ভাবে সাধুবাবাকে কথা বলাবার চেষ্টা করলে সাপটা তেড়ে আসে। মহাবীর এবার আমাকে প্রায় জোর করেই টেনে তুলল।

সাধুটি অত্যন্ত বিকৃতাকার। কোন্ পদ্ধতিকে কি ধরনের সাধনা করেন কে জানে। বাইরে এ ধরনের সাজসজ্জা করে যারা লোকদের প্রতারণা করে, তাঁকে সে দলের মনে হল না। টাকা-পয়সার যে প্রত্যাশী তাও নয়। যারা লোককে বিভ্রান্ত করে টাকা-পয়সা আদায় করে, তারা সাধারণত খুব বক্‌বক্ করে। নিজেদের ক্ষমতা জাহির ক'রে পয়সা আদায়ের ফাঁদ পাতে। এ ধরনের কোন কিছুই করার দিকে এর লক্ষ্য দেখলাম না। কী বিদ্যা এ আয়ত্ত করেছে কে জানে!

এ ধরমের এক সাধুর কথা শুনেছিলাম আমি কলেজ স্ট্রীটে টেমার লেনে বিশ্বজ্ঞান প্রকাশনীর দেবকুমার বসুর কাছে। দেবকুমার বসু অর্থাৎ দেবুদা আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তন্ত্র প্রসঙ্গে কথা বলতে তিনি আমাকে এক অদ্ভুত সাধকের কথা শুনিয়েছিলেন। বারাসত কিংবা বসিরহাট, কোন জায়গার কথা বলেছিলেন যথাযথ সে জায়গাটার নাম আমার মনে নেই। সম্ভবত বসিরহাটে নদীর ধারে এক শ্মশানের কথা বলেছিলেন। কি করে কার কাছে খবর পেয়ে-ছিলেন জানি না, তবে সেখানে এক উলঙ্গ সন্ন্যাসীর কথা শুনেছিলেন তিনি। কৌতূহলবশতঃ সেই সন্ন্যাসীকে দেখতেও গিয়েছিলেন। নিঝঝুম দুপুরে নদীর ধারে উলঙ্গ সেই সন্ন্যাসী একা বসে একটা মড়ার পা চিবুচ্ছিলেন। দেবুদাকে দেখতে পেয়ে হিঃ হিঃ হিঃ করে হেসে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, অনেকদিন পরে একটা ছোট বামুন মেয়ের পা পেয়েছি। পোড়াতে এসেছিল ওরা। ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে

পাটা ছিঁড়ে নিয়েছি। কচি মাংস তো তাই লোভ সামলাতে পারলুম না আর। তা বাবা তুই এখানে কেন?

একা শ্মশানে উলঙ্গ বিশৃঙ্খল বেশবাস সন্ন্যাসী মড়ার পা চিবিয়ে খাচ্ছে এ দৃশ্য পৈশাচিক। সাধারণ লোকের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেবুদার সাহস অপরিসীম। রহস্য প্রিয়তাও তাঁর অসীম। তিনি বললেন, শুনলুম আপনার কথা, তাই দেখতে এলুম।

সন্ন্যাসী বললেন, এলি তো, কিন্তু কোথায় এলি? তোরা শহরের ভদ্দর নোক, তোদের বসতে দিই কোথায় বলতো! তা বোস্ বোস্। একখণ্ড শ্মশানের অর্ধদগ্ধ কাঠ ঠেলে দিলেন তিনি দেবুদার দিকে। দেবুদা সেই কাঠে বসলে পরে সন্ন্যাসী বললেন, কি খেতে দিই তোকে বলতো!

দেবুদা বললেন, খেতে তো আসিনি। এসেছি আপনাকে দেখতে।

—অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে, তাইতো?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ, কিছুটা তাই।

সন্ন্যাসী বললেন, আমি কিচ্ছু জানি না রে। সব ফাঁকি। একটু আধটু ম্যাজিক জানি। তা বাবা কি খাবি বল্।

দেবুদা বললেন, কি আর খাব, কিছু না। আপনি শ্মশানে-মশানে ঘুরে কি পেলেন তাই বলুন।

সন্ন্যাসী বললেন, কিছুই না।

—তবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?

—আর কি করব, আর তো কোন কাজ করতে শিখিনি। এখন আর ঘরে গেলে নেবে কে।

দেবুদা বললেন, আপনি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলে সবাই নেবে।

—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ, সন্ন্যাসী এক মুখ দাঁত বের করে বললেন, আসলে কি জানিস্ অসুস্থই হয়ে গেছি আমি, বদ্ধ পাগল। থাক, সে-সব কথা থাক। তুই আমার অতিথি তো, কিছু তো খেতে দিতে হবে, দেখি।

সন্ন্যাসী হাততালি দিলেন। এই নির্জন মহাশ্মশানে কে জানে কোথা থেকে অল্প বয়সের একটা মেয়ে এসে হাজির। হাতে সাধারণ রেকাবীতে কয়েকটা গরম পুরি ও তরকারি। দেবুদা একেবারে অবাক হয়ে গেলেন, কোথা থেকে মেয়েটি এল! আকাশ ফুঁড়ে নাকি! খাবেন কি, তিনি মেয়েটির দিকেই তাকিয়ে থাকলেন। শুধু লক্ষ্য রাখতে লাগলেন, কোথায় সে যায়। কিন্তু তিনি লক্ষ্য রাখা সত্ত্বেও অকস্মাৎ মেয়েটি যে কোথায় উধাও হয়ে গেল, তিনি তার হদিস করতে পারলেন না। খাবার খেয়ে দেখলেন, সাধারণ গেরস্ত ঘরে যে রকম পুরি তরকারি হয় ঠিক সেই রকম।

দেবুদা সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকাতে তিনি পাগলের মত হাসতে হাসতে বললেন, কিছু না, কিছু না, একেবারে ভোজবাজি বুঝলি। ম্যাজিক।

ভোজবাজি, ম্যাজিক, যা-ই হোক না কেন এরকম কাহিনী কিন্তু আরও শোনা গেছে। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গে'র দ্বিতীয় খণ্ডে এ ধরনের একটা কাহিনী লিপিবদ্ধও আছে। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে সাধু সন্ন্যাসীর খোঁজ করে বেড়িয়েছেন তিনি। সেখান থেকে চড়াই ভেঙে গাংনানীর পড়াওঠা লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত ক্লান্ত। এমন সময় একটা অদ্ভুত ধরনের গাছ দেখতে পেলেন তিনি। সেই গাছটির তলায় আসতেই কেন যেন ক্লান্তি অনেকটা তাঁর কমে গেল। চারদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। এই অদ্ভুত ধরনের গাছটি সম্পর্কে প্রশ্ন করবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। তিনি যখন এইভাবে ভাবছেন, তখন তাঁকে একেবারে অবাক করে দিয়ে এক দীর্ঘকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসী যেন গাছটির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। মাথায় একটা ভারি ওজনের বোঝার মত তামা রংয়ের জটা। দেহের রংও তাম্রাভ। চোখ দুটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত। তাকে দেখে তন্ত্রাভিলাষী প্রমোদবাবু প্রণাম করলেন। কেন করলেন তা বুঝতে পারলেন না। সেই মুহূর্তে তিনি নিজের মধ্যে অনির্বচনীয় এক আবেগশূন্য ভাব অনুভব করেছিলেন। সন্ন্যাসী তন্ত্রাভিলাষীকে জিজ্ঞেস

করলেন, তু যমুনোত্তরী কি আসামী? প্রমোদবাবু বললেন, জী হাঁ মহারাজ।

সন্ন্যাসী বললেন, মেরে সাথ তো চল্। হামভি উধার যাউংগা।

প্রমোদবাবু দীর্ঘকায় সেই সন্ন্যাসীটির পেছন পেছন চলতে চলতে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন। কিন্তু ক্ষুধাবোধ তাঁকে রীতিমত তাড়না করছিল। সন্ন্যাসীটি তা বুঝতে পেরে যেন সামান্য মৃদু হেসে ফিরে তাকালেন। তারপর একটি ঝরণার কাছে এসে থামলেন। সেখানে একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ঘন ঘন হাততালি দিয়ে যেন গানের তালে তালে ডাকতে লাগলেন—গাঁঙনী, গাঁঙনী, গাঁঙনী। মিনিট তুই তিন পরেই একটি লাবণ্যময়ী মেয়ে ধীরে ধীরে ঝরণার ধার দিয়ে এগিয়ে এসে সেই সন্ন্যাসীটির সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেঁও যোগী?

মেয়েটির পরনে নীল রং-এর ঘাগরা, উপরে কাঁচুলি, তার উপর একটা সাদা ওড়না। তার অনিন্দ্যস্থন্দর রূপের দিকে তাকিয়ে লেখক বাক হারিয়ে ফেললেন। তার সমস্ত দেহ যেন সৌন্দর্যের নিখুঁত মসলা দিয়ে সমতালে গড়া। কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। এত সৌন্দর্য কোথায় কি ভাবে সম্ভব লেখক তাই ভাবতে লাগলেন।

সন্ন্যাসীটি মেয়েটিকে বললেন, হামলোক উপর যাতে, অব্ ইহাঁ কুচ্ খিলায় পিলায় তো দে।

মেয়েটির মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, আচ্ছা। তারপর ঝর্ণার ধারে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলল, ইহাঁ বৈঠ যা। নৃত্যের তালে তালে সামনের ঝোপের মধ্যে কোথায় মেয়েটি আড়াল হয়ে গেল। তাকে আর দেখা গেল না। সন্ন্যাসীটি গাঁঙনীর নির্দেশিত স্থানে গিয়ে বসে পড়লেন। প্রমোদবাবুও তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন। ওঁরা তুজনে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রবলে যেন সেই লাবণ্যময়ী মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে এসে গেল। তু'হাতে প্রকাণ্ড তুখানা পাতায় খাদ্য। পাতা তু'খানি ওদের সামনে নামিয়ে দিয়ে বলল, খা লে বাচ্চা, খা লে। একথা বলেই আবার সেই ঝোপের আড়ালে চলে গেল। সেখানে

কোন লোকালয় নেই, ঘর বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। মেয়েটি যে কোথায় গেল কে জানে। মেয়েটির পরিচয় কি তাই বা বলবে কে! পাতাতে দেওয়া আছে দুটি মিষ্টি ফল, চাকা চাকা পুরু চারখানা গাওয়া ঘিয়ে মাখানো গরম রুটি। রুটি আছে প্রমোদবাবুর পাতেই, সন্ন্যাসীর পাতে শুধুমাত্র দুটি ফল। ফল দুটি খাওয়ামাত্র সমস্ত ক্লান্তি দূরে চলে গেল। তারপর রুটি খেয়ে দেহে নতুন শক্তি পেলেন লেখক। আর একবার যদি গাঁওনীর দেখা পান এই আশায় প্রমোদবাবু ঝোপের দিকে তাকালেন। কিন্তু উলঙ্গ সন্ন্যাসী চোখের ইঙ্গিতে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, আর দেখা হবে না।

ক্লান্তি দূর হবার পর সেই নাংগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রমোদবাবু অনেক দূর এসেছিলেন। যমুনার ধারে একটা জায়গায় এসে দিনশেষে তাঁরা বিশ্রাম নেবার জন্য বসেছেন, হঠাৎ প্রমোদবাবুর মনে হল এই নাংগা সন্ন্যাসীর কিছু যোগবিভূতি দেখেন। সে আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছে ব্যক্ত করতেই সেই সন্ন্যাসীটি এমন দৃষ্টি হেনে প্রমোদবাবুর দিকে তাকালেন যে, তাঁর ভিতরের সমস্ত অনুভূতিই যেন তাতে শীতল হয়ে এল। সন্ন্যাসী বললেন, আরে অন্ধ্যা? তু ক্যা দেখা? ভুখে মরতে বখৎ গাঁওনীকী মিলি নহী? বো খিলায়া পিলায়া নহী? অব্ ঠাণ্ডা হোকে যোগবিভূতি দেখনে মাঙতে?—তু অন্ধ্যা, বাঙালী লেউণ্ডে! এর পরই যোগী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

প্রমোদবাবুর যোগীবর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন বটে, তবে দেবকুমারবাবুর যোগীবর তা যান নি। কলকাতায় ফিরে এসে দেবুদা বোধহয় যদ্দূর আমার মনে আছে ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তকে খবর দিয়েছিলেন। তাঁরা এই অদ্ভুত তান্ত্রিক অথবা যোগীকে দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য কোন যোগবিভূতি সেই সন্ন্যাসী তাঁদের দেখান নি।

সকরিগোলির পাহাড়ে যে তন্ত্রসাধককে দেখলাম—আমার মনে হয় এও সেই শ্রেণীর যোগী সাধক। ভাগ্যে থাকলে কিছু যোগবিভূতি দেখা যেত। কিন্তু মহাবীর এতটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, তার

জন্য অতটা অপেক্ষা করা আর সম্ভব হল না। সেজন্য মনটা আমার খুঁত্ খুঁত্ করতে লাগল।

মহাবীর একটু দূরে সরে এসে বলল, এধরনের তান্ত্রিকের পারে কাছে বেশীক্ষণ থাকতে নেই। কারণ এরা অনেক সময় মানুষের উপর ভূত-প্রেতের ভর করিয়ে দিতে পারে। আসলে এরা হল পিশাচসিদ্ধ। নইলে অমন করে পচা গলা মড়ার মাংস খেতে পারে!

এদের অভ্যন্তরে যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে সে কথা কে বলবে। তারাপীঠে মড়া খায় এমন তান্ত্রিকের সন্ধান অনেকেই পেয়েছে। নিজের বিষ্ঠা খাচ্ছে অমৃত জ্ঞানে এমন ক্ষ্যাপা সাধকের দৃষ্টান্তেরও সেখানে অভাব নেই। কোন যোগবিভূতি আমার প্রত্যক্ষ হয় নি। সেটা দেখবার ভারি ইচ্ছে ছিল। মহাবীরের জন্য তা হল না। সত্যি কথা বলতে কি আমি নিজেও যে অবচেতন মনে কিছুটা ভয় না পেয়েছিলাম তাও নয়।

শীতের দিনের সূর্য দুপুর থেকেই ম্লান হতে থাকে। দক্ষিণে হেলানো সূর্য পশ্চিমে যতটাই যায় তার গায়ের উত্তাপ ততটাই কমে যেতে থাকে। হলুদ রঙে অদ্ভুত একটা মলিনতা দেখা দেয়। তখন উৎসাহ উদ্দীপনার চাইতে অদ্ভুত এক আলস্য মনকে ক্লান্ত করে তোলে। বিকেলের রোদে সেই উদাসীন ক্লান্তি ফুটে উঠেছে। রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর কিছুক্ষণ পরেই সূর্যটা আড়ালে চলে যাবে। গঙ্গা ছুঁয়ে আসা উত্তরের বাতাস দুপুর থেকেই কামড়াতে থাকে। বিকেলে তার আক্রমণে রীতিমত কম্পন শুরু হয়ে যায়। মহাবীর তাই ফেরার জন্য পা বাড়াল। পথে নেমে সে বলল, ফালতু আয়া। এ ঠিক আসলে সাধু নয় রে।

বুঝলাম, বাইরের রূপটা মহাবীরকে বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু আমার মনে হল এ সাধু আগমার্কা খাঁটি সাধু না হলেও এর মধ্যে ভেজালের পরিমাণও খুব একটা নেই। অন্তত আমার সম্পর্কে সাধুটি যা বলেছে, তা যে অর্থহীন নয় তা বোঝার ক্ষমতা আমার আছে।

মহাবীর বলল, পাহাড়ের টিলার উপর যে বাঙ্গালী বাবার নতুন

আশ্রম উঠেছে, সেখানে নতুন এক বাঙ্গালী সাধু এসেছেন। এদের মত ভড়ং নেই। ভাল লোক, একদিন তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করা যাবে।

আমি বললাম, চল না, আজই তাঁর সঙ্গে দেখা করে যা-ই !

মহাবীর বলল, না। অন্ধকার হবার আগেই বস্তিতে ফিরে যেতে হবে। বাঘের উৎপাত আবার কিছুদিন যাবৎ বেশ বেড়েছে। কাল-পরশু আবার আসব।

বাঘের কথা শুনে মহাবীরকে আর খুব চাপ দিলাম না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সুখসেনা বস্তির দিকে ফিরতে লাগলাম। ফেরার পথে সেই সর্পতান্ত্রিকের কথাই ভাবতে লাগলাম। সাপ সম্পর্কেই তাঁকে আমার জিজ্ঞাসা করবার ছিল। কিন্তু এমন বিভ্রান্ত হলাম যে, সে কথাটা আর বিশদভাবে জিজ্ঞাসা করবার ফুরসৎই পেলাম না। সাধুটি বাইরে এমন আবরণ সৃষ্টি করে রেখেছে যে, ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করবার সাহস সাধারণ মানুষের হবে না। ঠিক যেন অঘোরী ধরনের চেহারা। কাপালিকরাও এই ধরনের উলঙ্গ থাকে ও নরকরোটির মুণ্ডমালা গলায় পরে। তবে খাঁটি অঘোরী ও কাপালিকরা যথার্থই তত্ত্বজ্ঞানী। এঁরা এক ধরনের অঘোরী পরমহংস। পৃথিবীর সব কিছুকেই ব্রহ্মময় বলে বোধ করে। এঁরা বিষ্ঠা ও চন্দনকে সমান জ্ঞান করে। এজন্য অনেক বীভৎস কাজও করে বেড়ায়। সকল জিনিসকে সমান দৃষ্টিতে দেখে বলে শরীরে বিষ্ঠা মূত্রাদি লেপন করে ও করোটি পাত্র সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অঘোরী হতে হলে যথা নিয়মে সন্ন্যাস নিয়ে অঘোর মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হয়। সন্ন্যাসীরা অঘোর মন্ত্রকে অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন মনে করেন এবং অঘোরীদের দৈব শক্তিসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করেন। এইজন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে : অঘোরান্ন পরো মন্ত্রঃ। অর্থাৎ অঘোর মন্ত্রের পর আর মন্ত্র নেই। শৈব উদাসীনেরা বলেন যে, অঘোরীরা নরবধ ও নরমাংস ভোজন করেন—মন্ত্রবলে আবার তাদের পুনর্জীবিতও করতে পারেন। আগে অঘোরীরা উৎকট নিয়ম অনুসরণ করে ঘোররূপা শৈবশক্তি বিশেষের অর্চনা করতেন। হাড়গোড়ের মালা পরতেন। নরকপালকে দণ্ডকমণ্ডলু হিসেবে ব্যবহার করতেন। মদ

খেতেন, মাংসও খেতেন, নরবলি দিয়ে সাধনা করতেন। ভবভূতির মালতী-মাধব নাটকে অঘোরঘণ্ট নামে যে কাপালিকের বর্ণনা আছে। আসলে তিনিও ছিলেন অঘোরপন্থী সন্ন্যাসী। চামুণ্ডার কাছে বলি দেবার জন্যই তিনি মালতীকে নিয়ে এসেছিলেন। অঘোরীদের মত অঘোরপন্থী নামে এক ধরনের যোগীও আছে। এঁরাও মদ মাংস খান। সর্পের অস্থি ও অন্যান্য পশু বা মানুষের কপাল ধারণ করেন। এঁরাও না বিবমিষা উদ্রেককারী ব্যবহার করে থাকেন। এঁরা শিবের উপাসক, এজন্য অস্থি মালা ও করোটি মালার সঙ্গে রুদ্রাক্ষ মালাও পরেন। সকরিগোলির সর্প-তান্ত্রিকের গলায় আমি রুদ্রাক্ষের মালাও দেখেছি। অঘোরপন্থী যোগীরা ক্ষৌরী হন না এবং কেশ ও শ্মশ্রু রেখে দেন। তবে এক ধরনের নকল সন্ন্যাসীও আছে যারা অঘোরী বা অঘোরপন্থী যোগীদের মত ব্যবহার করে। ধর্মের নামে ভিক্ষা করে। মন্ত্রতন্ত্র ও ফুঁকফাঁক করে। রোগ সারিয়ে দিতে পারে বলে নানারকম ক্রিয়াকর্ম করে। নানাভাবে এরা লোককে প্রতারিত করে অর্থ সংগ্রহ করে। এদের মধ্যে কেউ গলায় সাপ পেঁচিয়ে রাখে। দর্শকদের অনেকের গলায় সাপ ঝুলিয়ে দিয়ে অর্থ না দেওয়া পর্যন্ত সাপের বাঁধন খুলে দেয় না। সাপের ভয়ে অনেকে তাড়াতাড়ি অর্থ দিয়ে মুক্ত হয়। সম্ভবতঃ এদের উদ্দেশ্য করেই দত্তাত্রেয় সংহিতাতে এই ধরনের শ্লোক আছে ·

> "মুণ্ডী চ দণ্ডধারী বা কাষায় বসনোঽপীবা।
> নারায়ণবদোবাপী জটিলভস্মলেপনঃ ॥
> নম শিবাযবাচ্যোবা বহুবর্চ্চাপূজকোঽপিবা।
> ক্রিয়াহীনোঽথবা ক্রূরঃ কথং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াত্ ॥

অর্থাৎ মুণ্ডিত-মস্তক, দণ্ডধারী, কাষায়বর্ণ বস্ত্র, পরিহিত 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণকারী, জটাজুট যুক্ত, ভস্মলিপ্ত 'নমঃ শিবায়' এই শব্দ উচ্চারণকারী বহুমূর্তি পূজক ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত হয়েও যদি কেউ ক্রূর হয় অথবা যথাবিহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান না করে তাহলে কি ভাবে সে সিদ্ধি অর্জন করবে? সকরিগোলিতে প'হারী বাবার গুহার সামনের সেই সর্পসাধকটি কোন্ দলের তা কি করে বলব। বেশবাস দেখে তো কিছু অনুমান করা

যায় না। বীভৎস আকৃতির অন্তরালেও করুণাধারা প্রবাহিত থাকতে পারে। সৌন্দর্যের আবরণে মৃত্যু লুকিয়ে থাকতে পারে। **'Face is the index of mind'** একথা যেমন সর্বত্র প্রযোজ্য নয়, পোশাক পরিচ্ছদও তেমনই মানুষের অন্তস্তলের পরিচয় বহন করে না। অনেক ভদ্রবেশী লোক জোচ্চোর হয়। অনেক খুনীর ছবি পাওয়া গেছে যারা দেখতে খুবই নিরীহ। মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করলে তবেই তার যথার্থ স্বরূপ ধরা যায়। ভাবলাম ভয় কাটিয়ে আর একদিন প'হারী বাবার মুখে সেই সন্ন্যাসীর গুহার কাছে বসতে হবে।

ছয়

প'হারী বাবার গুহার কাছে সেই বীভৎসবেশী সর্পসাধককে দেখা অবধি আমার মনে শান্তি ছিল না। মহাবীর বলেছিল সে আমাকে সকরিগোলি পাহাড়ে প'হারী বাবার গুহার কাছে বাঙালী বাবার মঠে নিয়ে যাবে, সেখানে নাকি ভদ্র এক সাধু আছেন। দু'দিন না যেতেই মহাবীরকে সেই সাধুর কাছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য জোর তাগাদা লাগালাম। ফলে আর একদিন বেশ একটু সময় হাতে করে নিয়েই মহাবীর আমাকে নিয়ে সেখানে গেল। বাঙালী বাবার আশ্রমে নতুন সাধু দেখার চেয়ে আমার মনে কিন্তু সেই সর্পতান্ত্রিক সম্পর্কেই বেশী কৌতূহল ছিল। ভেবেছিলাম ওখানে গিয়ে মহাবীরকে বাঙালী বাবার আশ্রমে নতুন সাধুর উদ্দেশ্যে ঠেলে দিয়ে আমি নিজে আবার সেই বীভৎসবেশী সন্ন্যাসীর কাছেই যাব। আর ভয় পাব না, ভয় দেখালেও নয়। সত্যিকারের জ্ঞানী সাধকেরা অনেক সময় ভয় দেখানোর নামে যথার্থ অনুসন্ধানী ভক্তের মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। ভয় ভ্রূকুটিকে অবহেলা করে যিনি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেন তিনিই পরম আকাঙ্ক্ষিত জিনিস লাভ করতে পারেন। আমি স্থির করলাম, আজ আর ভয় পাব না।

কিন্তু আমার সমস্ত ইচ্ছাই পণ্ড হল। পথে আসতে আসতে মনের মধ্যে যত কল্পনার জাল বিস্তার করেছিলাম তার কোনটাই টিকে থাকল না। প'হারী বাবার গুহার কাছে আসতেই শুনলাম দুদিন আগেই সেই সন্ন্যাসী ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে। লোকজনের ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছিল, সেইজন্যই স্থান ত্যাগ করেছে। গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওপারের দিকে কোথায় গেছে। খুবই আশ্চর্য লাগল। সকরিগোলির ঘাটের কাছে গঙ্গা এখানে খুবই বিস্তৃত। ওপারে মণিহারী ঘাটকে দেখা যায় কি যায় না। স্টীমারে যেতেও বেশ সময় লাগে। সন্ন্যাসীটির কি দুঃসাহস! অবলীলাক্রমে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ওপারের দিকে গেছেন! এঁদের পক্ষে কি যে সম্ভব, আর কি যে সম্ভব নয়, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অনুমান করা সহজ নয়। দুধচটির সেই সন্ন্যাসীকে অনেক উঁচু গিরিখাদের ধার থেকে নির্ভয়ে নিচে প্রবাহিতা অলকনন্দার স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছিলাম। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। শুধু মনে হতে লাগল হাতের কাছেও একটা বিরাট সুযোগ পেয়ে হারালাম।

প'হারী বাবার গুহা থেকে কিছু উপরে উঠলেই বাঙালী বাবার আশ্রম। আশ্রমের পরিবেশ মনোরম। পাহাড়ের উপর মন্দিরের আঙিনায় সবুজ ঘাস আছে। যাত্রীনিবাসও আছে। এক সময় সেই বৃদ্ধ বাঙালী সাধকটি থাকতে বহু শিষ্য সামন্ত এখানে আসতেন। এদের জন্যই বোধহয় এই যাত্রীনিবাসটি তৈরী করা হয়েছিল। মূল বাঙালী বাবা নেই। একজন শিষ্য আশ্রমটা দেখাশুনা করেন। সেই বৃদ্ধ বাঙালী বাবা বেঁচে থাকতেই আর একটি টিলার উপর নতুন একটি মঠ উঠছিল। সেখানকার দৃশ্য আরও মনোরম। আমি মহাবীরকে বললাম, তোমার সেই নতুন সাধু কোথায়?

মহাবীর এগিয়ে গিয়ে এখানকার একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করল, এখানে যে নয়া সাধু আয়া উলোক কাঁহা?

সাধুটি বললেন, তিনি ঐ উপরের মঠে আছেন।

মহাবীর আমাকে নিয়ে উপরের টিলা বেয়ে উঠতে লাগল

ছোট এই বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের মধ্যে এ টিলাটাই সবার উপরে। নিচে যেখানে পুরানো মঠ তার চারদিকে সবুজের একটা গাঢ় স্পর্শ আছে। একটা পার্থিব স্নিগ্ধতা আছে। কিছুটা সীমাবদ্ধতার বেষ্টনী আছে। কিন্তু উপরের টিলার মাথায় অফুরন্ত আলোর ছড়াছড়ি। সীমানার বন্ধন যেন ছিন্ন হয়ে গেছে আলোর দীপ্তিতে। নতুন মঠের চূড়াটিও বেশ উঁচু। উপরের ত্রিশূলের সূক্ষ্মচূড়া ঊর্ধ্বে নীলের সঙ্গে যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্রে বাঁধা। পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়ের বেষ্টনী। দক্ষিণে বাব্‌লাবন ছাওয়া নিচের সমতল ভূমি। তারই মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে রেললাইনের দুটি সূক্ষ্মরেখা দেখা যায়। মনুষ্য বসতির খড়ো চালগুলিকে অকিঞ্চিৎকর বলে বোধ হয়। উত্তরে মোহময় হাতছানি দিয়ে পাহাড়ের রেখা টানা অফুরন্ত দিগন্ত। পূবে রূপালীস্রোত প্রশস্ত গঙ্গা। গঙ্গার একটা বিশেষ মহিমা, সবিশেষ পবিত্রতা আছে—যেটা এখান থেকে গঙ্গাকে দেখলেই বোঝা যায়। অলকনন্দাতে স্বর্গীয় দীপ্তি দেখেছি হিমালয়ের কোলে। প্রবল উচ্ছ্বাসে স্বর্গের গন্ধ বুকে নিয়ে গঙ্গাকে ছুটে চলতে দেখেছি হরিদ্বারে। কাশীর ঘাটেও তাকে অধ্যাত্ম ভারতের প্রাণপ্রবাহ টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি। বিহারের এই অংশের গঙ্গার সঙ্গেও যে বহুদূর স্বর্গের একটা সরাসরি যোগ আছে তা বোঝা যায়। সম্ভবতঃ গঙ্গা তার মহিমা হারিয়ে ফেলেছে হুগলীর মুখে। বাণিজ্য তরী অধ্যাত্ম স্নিগ্ধতার উপর বলাৎকার করে। গঙ্গার যে ধারা পদ্মা হয়ে বয়ে গেছে পূর্ববঙ্গের উপর দিয়ে তার মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের প্রচুর উপাদান ছড়িয়ে থাকলেও গঙ্গার অতীন্দ্রিয়তা নেই। সম্ভবতঃ সেই কারণেই পদ্মা হিন্দুমানসে অধ্যাত্মমূল্য লাভ করতে পারে নি। ছোটবেলায় গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে পিসিমাকে শ্লোক আবৃত্তি করতে শুনতাম :

গঙ্গা গঙ্গা ভাগীরথী গঙ্গে
ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে—ইত্যাদি

গঙ্গা ত্রিভুবনতারিণী কিনা জানি না। তবে ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে যে বিপদতারিণী শস্যদায়িনী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সেই বাস্তবরূপ ছাড়িয়ে বিহারের সাঁওতাল পরগনা অবধি যে তার অধ্যাত্ম

বিস্তার এখনো বর্তমান সকরিগোলির এই বাঙালী বাবার মঠে দাঁড়িয়ে গঙ্গাকে দেখলে সে-কথা চিন্তা করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না।

মহারাজপুরের পরেই গঙ্গা আরো পূব দিকে বাঁক নিয়েছে মণিহারীর দক্ষিণ প্রান্তে মহানন্দা নদী এসে গঙ্গায় পড়েছে। পাশেই মালদহের মহানন্দটোলা। তারপর আরও কিছু দক্ষিণে ভুত্নী দিয়ারা। দিয়ারার বাঁক ফরাক্কা হয়ে গেছে মুর্শিদাবাদের মধ্যে। সেখানে গঙ্গার কি রূপ দেখিনি। ছোটবেলায় জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জের মাঝখান দিয়ে একবার এই গঙ্গাকে দেখেছিলাম। তার যথার্থ রূপ আজ আর আমার মনে নেই। বাংলাদেশের অনেক ইতিহাস তার বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। আজ হয়তো সেখানে বসলে ইতিহাসের আলোতে ভাগীরথীর বিচিত্র রূপ অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু সে-সব থাক। সকরিগোলির গঙ্গার কথা বলছি, সে-কথাই বলি। সেদিকে তাকিয়ে যথার্থই আমি মুগ্ধ হলাম। যে বাঙালী বাবা এখানে মঠের পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। পরিবেশের মূল্য আছে বৈ কি। স্থান মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই আছে। দার্জিলিং-এর মহাকালের মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে যদি কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় মেঘ রোদ্দুরের খেলা দেখা যায়—তখন 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' শব্দটি মনে পড়বেই। যদি পূর্ব দিগন্তে বরাবর বিদ্যুতের মত হিমশৃঙ্গের তুষারকিরীট দেখা যায়—তাহলে অবশ্যই ধরণীর বৈচিত্র্যের কথা মনে পড়বে। আবার হরিদ্বারের কলস্রোতা গঙ্গার দিকে তাকালেই মনে হবে অতীত ভারতের কথা। লছমনঝুলা থেকে হিমালয়ের পয়দলের পথে এগিয়ে গেলে মনে হবে যে হল এ দেবভূমি। পার্থিব সত্তা সেখানে ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যায়। স্থান মাহাত্ম্য আছে বলেই দেশের নানা প্রান্তরে পীঠের কল্পনা। 'পীঠ' শব্দের অর্থ অনেকের মতে সাধনার বিশেষ ধারা। স্থান মাহাত্ম্যে ভারতবর্ষে এক এক স্থানে এক একটি সাধনার ধারা গড়ে উঠেছে। সকরিগোলির টিলার চূড়ায় এই মঠেরও একটা মাহাত্ম্য আছে বুঝতে অসুবিধা হল না। যেন মহা শাক্তপীঠ কামাখ্যার দিকে মুখ করে এই মঠটি দাঁড়িয়ে আছে। নিগ্রন্থ হয়ে এখানে সাধনা করা যায়।

আমি যখন মঠের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের এইভাবে মনে মনে বিশ্লেষণ করছিলাম মহাবীর তখন খোঁজ করছিল সেই নবাগত সাধুটির। নতুন মঠে উঠবার সময়ই বারান্দায় সাধারণ শ্বেতবস্ত্রে আবৃত একজন ব্রহ্মচারীর মত দেখেছিলাম। বয়স বেশী নয়। দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ কেশ। ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু। মুখে একটা নিখিল বিশ্বের মায়া জড়ানো। করুণার্দ্র চোখ। সমস্ত দেহে অদ্ভুত একটা বিনয়ের ভাব। মহাবীর তাঁকেই জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ইধার যে নয়া সাধু আয়া, উ কাঁহা ?

তরুণ সাধুটি হাসলেন : এখানে তো কোন নতুন সাধু আসেননি !

মহাবীর বললো, হাম তো ঐসি শুনা।

সাধুটি বললেন, আজ্ঞে না। আমিই এখানে নতুন এসেছি।

কথাটি কানে যেতেই সাধুর দিকে আমি তাকালাম। তাঁর চোখের সঙ্গে আমার চোখের দৃষ্টি মিলে গেল। এমন অতলান্ত করুণার্দ্র চোখ আমি আগে কখনও দেখিনি। কেন যেন আমি নিজের মধ্যে একটা মাধুর্যের স্পর্শ পেলাম। খুব বিনীতভাবে সেই সাধুটি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আসুন, বসুন।

মঠের বারান্দায় আলোর অনাবিল ছড়াছড়ি। চতুর্দিকে অসীম দিগন্তের রহস্যময় হাতছানি। যেন পার্থিব জগতের উর্ধ্বে এ এক অন্য স্থান। এরই মধ্যে মধুর স্বভাবের একজন সাধুকে আমার কীই যে ভাল লাগল !

সাধুটি বললেন, এখানেই কাছে ভিতে থাকেন বুঝি ?

বললাম, না। কলকাতা থেকে এসেছি। এখানে আমাদের একটি পুরানো বাড়ি আছে এই যা।

—মঠ মন্দির ঘুরে দেখার নেশা আছে বোধহয় ?

বললাম, জানি না। তবে ভালই লাগে।

আমার কপাল এবং মুখের দিকে তাকিয়ে কি একটু দেখলেন যেন সেই সন্ন্যাসী। তারপর হাসলেন একটু।

আমি বললাম, হাসছেন কেন ?

সাধুটি বললেন, নিজের ভেতরটাকে বাইরের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন দেখে।

বললাম, ভেতরটা তো নিজেই আড়াল হয়ে আছে, আমি কি করব ?

তিনি বললেন, কেন ? মাঝে মাঝেই তো ভেতরের সাড়া পান।

তাকালাম সেই সাধুটির দিকে। বললাম, ভেতরের সাড়া ! জানি না।

তিনি বললেন, এখানেও তো সেই ভেতরটা খুঁজতেই এসেছেন !

বললাম, ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনার কথা !

তিনি বললেন, যা খুঁজতে বেরিয়েছেন, তাতো ভেতর ছাড়া বাইরে নেই !

অবাক হয়ে সাধুটির মুখের দিকে তাকালাম: কি খুঁজতে বেরিয়েছি বলুন তো ?

হাসতে হাসতে পূব দিকে পাহাড়ের একটা কোণে আঙুল দিয়ে ইশারা করে আমাকে তিনি সেই দিকে তাকাতে বললেন। দেখলাম একটা প্রকাণ্ড কালো সাপ পাহাড়ের ঢালু থেকে ফণা তুলে উপরে মঠের বারান্দায় আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

আমি রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম। মনে হল সাপটার সঙ্গে আমার যেন চোখে চোখেই হয়ে গেল। এবং মুহূর্তের মধ্যে সাপটা ফণা নামিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে সেই সাধুটির মুখের দিকে তাকালাম। সাধুটি হাসতে হাসতে বললেন, বাইরে সাপ। ভেতরে কুণ্ডলিনী।

—অর্থাৎ !

তিনি বললেন, বাইরে যখন ও ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সাপ, গর্তের ভেতরে গেলেই কুণ্ডলায়িত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

আমি বললাম, আপনি কি এই অর্থেই কথাটা বলেছিলেন ?

তিনি বললেন, যে যেমন অর্থে নেয়। সব কিছুই নির্ভর করে দেখার উপর জানেন।

—কি রকম ?

সাধু একটি গল্প বললেন : একটি লোকালয়ের কাছে গাছের নিচে একটি লোক বসেছিল। রাত দু' প্রহরে একজন চোর যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। সে ভাবল নিঝুম রাতে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে, নিশ্চয়ই চোর। সে এগিয়ে গিয়ে তাকে বলল, এই যে শুনছ ? আমি বড় রকমের একটা সিঁধ কাটতে যাচ্ছি। একজন সঙ্গীর দরকার, আমার সঙ্গে চল। লোকটি কোন কথা বলল না। চোরটি সামান্য একটু অপেক্ষা করে চলে গেল। তার তাড়া ছিল, তাই আর দাঁড়াল না। কিছুকাল পরে বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে একটা লোক সেই গাছের তলায় এল গলার দড়ি দিয়ে ঝুলবে বলে। এসে দেখল একটা লোক ঝিম মেরে বসে রয়েছে। ভাবল, এও বুঝি বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ঘর ছেড়ে এসেছে। সে তার কাছে গিয়ে বলল, এই যে ভাই, তুমিও কি বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে নাকি ! লোকটি কোন উত্তর দিল না। যে লোকটি গলায় দড়ি দিতে এসেছিল, সে ভাবল, আমিই বা তবে গলায় দড়ি দেব কেন। এর মত সংসার ছেড়ে চলে গেলেই তো হয়। সে গলায় দড়ি দেওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে লাগল। কিছুকাল পরে এক গৃহত্যাগী ঈশ্বর সন্ধানী ব্যক্তি সেই পথ দিয়ে গেলেন। তিনি চুপ করে বসে থাকা লোকটিকে দেখে ভাবলেন, আহাঃ ! ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট মনে ধ্যান করছেন। আমি যদি এমন নিবিষ্ট-চিত্ত হতে পারতাম !

সাধুটি গল্প শেষ করে আমার দিকে তাকালেন, কি বুঝলেন ?

আমি বললাম, তা ঠিক, মনেরই উপর সব নির্ভর করে।

সাধুটি বললেন, সাপকেও যে যেমনি দেখে ! যে ভেতরে দেখে সে ভেতরে তাকে তাড়না করে, যে বাইরে দেখে সে বাইরে তাকে তাড়া করে বেড়ায়।

আমি সাধুটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, খুব কৌতূহল হচ্ছে আমার জানেন ! দয়া করে সাপ সম্পর্কে আমায় কিছু বলুন না !

তিনি বললেন, আপনি তো অনেক বড় সাধকের কাছ থেকেই সাপ সম্পর্কে শুনেছেন।

—কি রকম ?

—কেন, হিমালয়ের কোলে কি কারো কাছে আপনি সাপের কথা শোনেন নি ?

আমার বিস্ময়ের সীমা থাকল না। সামান্যের মধ্যে অসামান্য লুকিয়ে থাকে এ-কথা অত্যন্তই যথার্থ। আমার বুঝতে কোন অসুবিধা থাকল না যে, এই তরুণ সাধুটি অনেক কিছু জানেন। তিনি বয়সে তরুণ হলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ। কিংবা যথার্থ তরুণ কিনা তাই বা কে বলবে ! হিমালয়ের দ্রোণগিরি থেকে এক সাধক এসেছিলেন আমার ঘরে। সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর ছাত্ররা। একদা এই সাধকটি ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। ছাত্ররাও অধ্যাপক। ছাত্রদের দেহে প্রৌঢ়ত্বের লক্ষণ স্পষ্ট। কিন্তু দ্রোণগিরির সাধকটিকে দেখলে ত্রিশ বছরের বেশী বয়স বলে মনে হয় না। যোগী সাধকদের বয়সের হিসেব সাধারণ গণনায় পাওয়া যায় না বোধহয়। এই দ্রোণগিরির সন্ন্যাসী নাকি যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ীর গুরুদেবের কাছ থেকে একই আসনে দীক্ষা নিয়ে সিদ্ধি অর্জন করেছেন। তাহলে তাঁর দীক্ষাদাতা গুরুর বয়স আড়াইশ তিনশ বছর নিশ্চয়ই। লোকপ্রবাদ, এই গুরুর নাম 'হইরা বাবা।' সুতরাং অধ্যাত্ম জীবনের সন্ধানীদের বয়েস হিসেব করবার চেষ্টা সাধারণ মানুষের কাছে অপপ্রয়াস মাত্র। সে চেষ্টা বাদ দিয়ে আমি তাঁকে বললাম. আপনি চেনেন তাঁকে ?

তরুণ সাধুটি হাসতে হাসতে বললেন, জগৎকে আত্মবৎ জ্ঞান করলে সবাইকে চেনা যায়। না হলে জানাশোনা জিনিসও অচেনা থেকে যায়। আপনিও তো এর অনেক কিছুই বোঝেন !

বললাম, কই আর বুঝি ! বুঝলে এমন করে পাগলের মত ঘুরে বেড়াবো কেন বলুন !

তিনি বললেন, সৃষ্টির উৎস পর্যায়ে মনকে নিতে পারলে বস্তু জগতেরও যে পরিবর্তন হয় এটা তো আপনি বোঝেন ?

বললাম, অনুমান করতে পারি, কিন্তু বুঝি এ কথা বলব না

তিনি বললেন, অনুমানই তো প্রথম সোপান। তারপরই অনুভব।

বললাম, সে সৌভাগ্য কি আমার হবে ?

তিনি কোন কথা না বলে শুধুমাত্র একটু হাসলেন। আমার বুঝতে বাকী থাকল না যে দুধচটির পথের ধারে সাক্ষাৎ পাওয়া সেই যোগীপুরুষের মত সকরিগোলির বাঙালী বাবার মঠের ধারের এই তরুণ সন্ন্যাসীটিও অলৌকিক শক্তির অধিকারী! এঁরা অন্তরের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান। এ জ্যোতি এঁরা বাইরে প্রকাশ করেন না। জোর করে প্রকাশ করে নিতে হয়। প্রকৃতি তাঁর অবগুণ্ঠন কখনই নিজে থেকে খুলে দেয় না। বৈজ্ঞানিকেরা জোর করে প্রকৃতির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন।

আমি কয়েকদিন আগে প'হারী বাবার গুহার সামনে দেখা সেই সর্পধর তান্ত্রিকের মাথার জটায় যে সাপ ছিল সেই সাপের অর্থ সাধুটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, জানেন, দু'দিন আগে এখানেই, নিচে প'হারী বাবার গুহার কাছে সম্ভবতঃ অঘোরপন্থী এক তান্ত্রিককে দেখেছিলাম। তাঁর মাথার জটায় একটি জ্যান্ত সাপ! এ-সাপের অর্থ কি বলতে পারেন ?

হাসতে হাসতে তরুণ সাধুটি বললেন, সাপ অন্ততঃ তার বশ মেনেছে।

—কিন্তু এর অর্থ কি ? সাপ দিয়ে উনি কি বোঝাতে চান ?

সাধুটি বললেন, স্বয়ং মহাদেবই তাঁর সাপ দিয়ে কি বোঝাতে চান বলুন তো ?

আমি বললাম, ও তো একটা প্রতীক মাত্র।

—কিসের প্রতীক ?

—সেটি অবশ্য আজও আমার কাছে রহস্য। তবে আমার নিজের মনে হয় সাপই প্রকৃতি।

তরুণ সন্ন্যাসীটি হেসে বললেন, এতই যদি বোঝেন তবে বাইরে সেই সাপকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন ?

বললাম, ভেতরে খোঁজার এলেম নেই বলেই তাকে বাইরে খুঁজছি।

তিনি বললেন, নিজের সম্পর্কে এত অপ্রত্যয় কেন? দুধচটিতে তো অনেক গূঢ় রহস্যই জেনে গেছেন।

বললাম, জানি না, কি জেনেছি। সাপ বলতে উনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সম্পর্কে এত গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে লাগলেন যে, ঠিক বুঝি বুঝি করেও যেন আমি বুঝতে পারলাম না।

—কিন্তু সর্পরহস্য ভেদ করতে হলে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যই জানতে হবে আগে।

—সাপের সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কি সম্পর্ক?

—কি সম্পর্ক নেই বলুন! সৃষ্টির মূলেই তো রয়েছে সাপ। দেখেন নি বিষ্ণু অনন্তনাগে সমুদ্রে শায়িত ছিলেন? তাঁর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা। ব্রহ্মা থেকে জগতের সৃষ্টি।

বললাম, এ প্রতীকের অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

হেসে সন্ন্যাসী বললেন, চেষ্টা করলেই স্পষ্ট হয়।

—কি রকম?

—ক্ষীর সমুদ্র হল···

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আচ্ছা **milky ways**, বাংলায় যাকে ছায়াপথ বলে. তাকেই কি ক্ষীরসমুদ্র বলা যায়?

—বলুন?

—বর্তমান পদার্থ বিজ্ঞানে দেখা যাচ্ছে অব্যক্ত কারণে মহাশূন্যের বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ হাইড্রোজেন কণা জমা হচ্ছে। সম্ভবতঃ আদিতে মহা-শূন্যে ছিল জল। সেই জলই নীহারিকাপুঞ্জ। এর মধ্যেই সৃষ্টির কারণ নারায়ণ সুপ্ত ছিলেন।

—তাহলে সাপ?

—এই অনন্তনাগের অর্থ টাই ধরতে পারিনি শুধু। যদিও সমুদ্র-মন্থন রূপ প্রতীকের একটা অর্থ আমি নিজে বের করেছি।

—যেমন?

—সমুদ্র নীহারিকাপুঞ্জ। বাসুকী সর্পের দ্বারা এই নীহারিকা মন্থন করে জগৎ সৃষ্টি হল।

—তাহলে গিরি কে?

—শিবলিঙ্গ। পুরুষের প্রতীক।

—সাপের সঙ্গে গিরির সম্পর্ক কি?

—সাপ হল প্রকৃতি। প্রকৃতি পুরুষের সংঘর্ষেই সৃষ্টি।

—কিন্তু সৃষ্টির কথা তো আপনি আগেই বললেন।

—কি রকম?

—নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যেই তো বস্তুজগতের প্রথম সৃষ্টি। পুরুষ ও প্রকৃতির মন্থনেই যদি নীহারিকাপুঞ্জের সৃষ্টি হবে তাহলে নীহারিকাপুঞ্জকে তাঁরা আবার মন্থন করবেন কেন?

আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না। এতদিন নিজের মনে এই চিন্তা করে আমি একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলাম। সেটা ভেঙে গেল যেন। তাই বললাম, সত্যিই এ রহস্য ভেদ করা আমাদের কাজ নয়। আপনি দয়া করে এই প্রতীকের অর্থটা একটু বলে দেবেন?

তিনি বললেন, আসলে ক্ষীরসমুদ্র হল কাল ও দেশ। আপনাদের বিজ্ঞানে যাকে বলে **space time continuam**। অনন্তনাগ হল হাইড্রোজেন কণা ইংরেজীতে যাকে বলে **universal living waters**। ভারতে এই **living waters**-কেই সর্প প্রতীক হিসেবে ধরা হয়েছে। আর বিষ্ণু হলেন নির্গুণ পুরুষ। এই **living waters**-এর সূক্ষ্ম উপাদানই হল মায়ারূপ সর্প, যে মায়া অব্যক্ত। সেই মায়ার সঙ্গে পুরুষের অভিঘাতে যে কম্পন তা থেকেই প্রকৃতির জন্ম। প্রকৃতি বিকৃত হলেই স্থূল নীহারিকাপুঞ্জ।

জিজ্ঞাসা করলাম সৃষ্টি রহস্যের কোন্ পর্যায়ে প্রকৃতি? হিরণ্যগর্ভ পর্যায়ে?

তরুণ সাধুটি বললেন, আরও একটু উৎসের দিকে এগিয়ে যান।

—অর্থাৎ?

—ঈশ্বর পর্যায়ের কথা ভাবুন না?

—অর্থাৎ আত্মা যখন স্বপ্নহীন নিদ্রায় ?

—যথার্থই ধরেছেন। এই তো দেখছি অনেকটাই বুঝতে পেরেছেন !

বললাম, এক সময় উপনিষৎ কিছুটা পড়েছিলাম তা থেকেই এই ধারণা।

তরুণ সাধুটি বললেন, কিন্তু উপনিষদের চাইতেও এই সৃষ্টি তত্ত্বের আরো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে তন্ত্রে।

—দয়া করে আমাকে একটু বলবেন ?

হাসতে হাসতে সাধুটি বললেন, হ্যাঁ, সেই সাপের কথা দিয়েই আরম্ভ করতে হবে তবে।

—কি রকম ?

তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোক বললেন :

"লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পীত্বা পুনঃ কুণ্ডলী
নিত্যানন্দমহোদয়াৎ কুলপথান্মুলে বিশেৎ সুন্দরী।
তদ্দিব্যামৃতধারয়া স্থিরমতিঃ সন্তর্পয়ে দৈবতং
যোগী যোগপরম্পরা বিদিতয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডস্থিতম ॥

—এর অর্থ দয়া করে একটু বুঝিয়ে দেবেন ?

তরুণ সাধুটি গঙ্গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাকে দেখালেন। কথা বলতে বলতে খেয়ালই করিনি যে সূর্য রাজমহল পাহাড়ের মাথায় ঘন লাল হয়ে পশ্চিম দিগন্তে পাটে যেতে বসেছে। তার রক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছে গঙ্গার বুকে। বহু দূরে ওপারের চরের দিকে জোড়ায় জোড়ায় চখাচখি গঙ্গায় ভাসছে। দিগন্তরেখায় বাংলাদেশের তটে ধূঁয়ার ছায়া দেখা যাচ্ছে। কুয়াশা ঘন হয়ে নামবে এর পরেই। স্টীমারের ভোঁ শোনা যাচ্ছিল। হয়তো এপার থেকে কোন স্টীমার যাত্রী নিয়ে ওপারে যাচ্ছে, নয়তো ওপার থেকে কোন স্টীমার এপারে আসছে। নিত্যদিন নদী পারাপারের খেলা। পাখিরা ডানা মেলে দিয়েছে আকাশে নির্দিষ্ট এক দিক লক্ষ্য করে। 'পাখির নীড়ের মত চোখ' তুলে শুধু মানবাত্মার জন্যই বোধহয় কেউ অপেক্ষা করে নেই।

কিংবা আছে বিশ্বপ্রকৃতি জুড়ে, আমরা দেখতে পাই না। আমাদের ঘর আত্মার গতির মুখে একটা স্টেশন মাত্র। শেষ স্টেশন কোথায় যেখানে সমস্ত ট্রেনের গন্তব্য শেষ ? জানি না। এখনও কোন জংশনই পার হতে পারিনি ! যাত্রা শেষে শেষ স্টেশনের ইঙ্গিত তো দূরঅস্ত্।

দিন পড়ে আসছে। জীবনেরও এমনি করেই দিন পড়ে আসছে। জীবন-সূর্যের মলিন রক্তাভা আমরা দেখতে পাই না তাই। জীবনের উৎস এবং অস্ত বুঝি এক। তাই প্রভাত-সূর্য যে রঙে রাঙিয়ে উদয় হয় অস্ত-সূর্য সেই রঙে রেঙেই অস্ত যায়। জীবনের অর্থকে জানতেই হবে। চিরস্থায়ী, চিরশান্ত অমৃতসাগরে ডুব দিয়ে মিশে যেতে হবে। গোমুখ দিয়ে গঙ্গা নির্গত হয়। সাগরে গিয়ে পড়ে। জীবনের মুক্তির জন্য কোন মুখ চাই। প্রথম মুখের সন্ধান পেয়েছিলাম দুধচটির পথের ধারে। অসমাপ্ত অভিজ্ঞতা আমাকে রীতিমত ক্লান্ত করে তুলেছিল। আমার মনে হয় দ্বিতীয় মুখের সন্ধান আমি সকরিগোলির বাঙালী বাবার মঠে অনেকদিন পরে আবার পেলাম। ঘরে ফিরছি বটে, কিন্তু সে আমার ঘর নয়। ঘরে ফেরার পথ রইল এখানে। এ পথে যে পাথেয় সঞ্চয় করে আসতে হবে, সে পাথেয়র সন্ধান নিতে হবে এখান থেকেই। তরুণ সাধুটিকে নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালাম। একটা অপ্রাকৃত গন্ধ পেতে লাগলাম চতুর্দিকে। নতুন উৎসাহ বোধ করলাম নিজের মধ্যে। কালই আবার আসব। সর্পরহস্যের নতুন সূত্র ধরে আবার এগিয়ে যেতে হবে। মহাবীরকে সঙ্গে নিয়ে সুখসেনার দিকে ফিরতে লাগলাম।

সাত

ফিরতে ফিরতে ভাবতে লাগলাম। আমরা দৈনন্দিন জীবনের কলকোলাহল নিয়েই ব্যস্ত। এবং সবচেয়ে মিথ্যা ও আশ্চর্য বিশ্বাসই চিরকাল আমাদের পরিচালিত করে আসছে। সেই মিথ্যা এবং আশ্চর্য

বিশ্বাস এই যে, আমরা চিরকাল বেঁচে থাকব না একথা জেনেও, মৃত্যুর কথা কখনও ভাবি না। সংসারের এটাই বোধহয় আশ্চর্য মায়া। এ মায়া না থাকলে জগৎসংসার অচল হয়ে যেত। এই এক মুহূর্ত আগের ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কি আছে, তা আমরা জানি না। অথচ জীবন নিয়ে কত গর্ববোধ করি। ভাল কি আছে তাও জানি না, মন্দ কি আছে তাও নয়। অথচ চিরকালের সত্য কি তা জানবার জন্যও বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি না। অদ্ভুত এক জীবনস্রোতে দিবারাত্র ভেসে চলেছি। অথচ জীবন-সত্যের সন্ধানই আমাদের সবচেয়ে প্রথম বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা উল্টোদিকে ঘুরছি। জীবন-সত্যের উদ্দেশ্যে যে বিষয় বা বিদ্যা তাকেই দেখছি অবজ্ঞার চোখে। দর্শন শুধু একটা শাস্ত্র নয়, আত্মদর্শনেও সাহায্য করে। অথচ শিক্ষিত লোকের মুখে প্রায়ই শোনা যায় **Philosophy** পড়ে কি হবে। **Outdated Subject.** অবশ্য পশ্চিমী **Philosophy** ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে পার্থক্য আছে। পশ্চিমী **Philosophy** তর্কবিদ্যার উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় দর্শন পরাবিদ্যা, তর্ক বিদ্যা নয়। তর্কবিদ্যা ব্যর্থ হলে অনুভূতিকেই ভারতীয় দর্শন শেষ সম্বল হিসেবে বর্ণনা করেছে। পশ্চিমী **Philosophy** আজ যদি কেউ চর্চা করেন এবং তাঁর যদি ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে ধারণা থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি স্বীকার করবেন যে, তর্কবিদ্যার রূপরেখায় ব্রহ্মের স্বরূপ যে অধরা রয়েছে তা নয়। কিন্তু তাতে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে একটা রূপরেখা রচনা করা গেলেও যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপ ধারণা করা যায় না। তর্ক বাহ্যিক। অনুভব ভেতরের। অনুভব বা অনুভূতিকে প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু কয়জনই বা আমরা সেই অনুভূতিকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করি? সেই অনুভূতি প্রসারিত হলে নাকি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মুহূর্তের মধ্যেই ধরা পড়ে যায়। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সম্ভবতঃ এই অনুভূতি ছিল। তাই তিনি ত্রিকালজ্ঞপুরুষ ছিলেন। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাতে পেরেছিলেন। এই অনুভূতিকে সম্প্রসারিত করা নিয়ে কথা। পথ ও মত ভিন্ন ভিন্ন। কেউ বলেন

জ্ঞানের পথে, কেউ বলেন ভক্তির পথে, কেউ বলেন যোগের পথে, কেউ বলেন তন্ত্রের পথে। অধীত বিদ্যা দ্বারা যে জ্ঞান, তা দ্বারা ধারণা হয়, অনুভব হয় না। মিষ্টি সম্পর্কে পড়াশুনা করে একটা ধারণা করা যায়, কিন্তু মিষ্টি না খেলে তার যথার্থ স্বরূপ ধরা যায় না। ভক্তি বা আত্মসমর্পণ একটা নরম স্নিগ্ধতার স্পর্শ দেয়। বিশ্বাসে আত্মশক্তি অদ্ভুতভাবে জাগরিত হয়। কিন্তু ভক্তি যখন কোন প্রতীককে কেন্দ্র করে তখন পরম সত্যের সন্ধান তা থেকে আসে কিনা জানি না। জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর সমন্বয় হলে সম্ভবতঃ জ্ঞানও সার্থকতা অর্জন করে ভক্তিও তার পরিপূর্ণতা পায়। তবে জ্ঞান হলে ভক্তি আসবে কাকে কেন্দ্র করে? জ্ঞান কোন প্রতীকের মধ্যে সীমিত নয়, কিন্তু ভক্তি প্রতীকের মধ্যে সীমিত। তথাপি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর নিজের জীবনে জ্ঞান ও ভক্তির সার্থক সমন্বয় দেখিয়ে গেছেন। তাঁর আরাধ্যা জগজ্জননী মা-কালী। অথচ তিনি কাল এবং কালী উভয়েরই অতীত জগতের স্বাদলাভ করেছিলেন। ব্রহ্মস্বরূপের ধারণা যোগের মাধ্যমেই নাকি সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। এবং সে পাওয়া হল নির্ভুল পাওয়া। তন্ত্রও এক ধরনের যৌগিক প্রক্রিয়া। তবে যোগের দ্বারা সরাসরি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করে তন্ত্র সর্পিনীকে জাগরিত করে। সেই সাপটাই আমার কাছে বিরাট এক প্রহেলিকা। তন্ত্র বলে সাপ আছে ভেতরে। অথচ বাইরেও দেখি সর্পপূজার অন্ত নেই। আমাদের মুখ্য দেবতাদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে সাপ। সকরিগোলির পাহাড়ে প'হারী বাবার গুহার কাছে যে অঘোরপন্থী সাধককে দেখেছি, তাঁরও শিরোভূষণ সাপ। বাঙালী বাবার নতুন মঠের তরুণ সাধকটিও কথা বলতে বলতে আমাকে একটা জলজ্যান্ত সাপ দেখালেন। এই সাপের অর্থ কি? বাইরের সাপ ও ভেতরের সাপ এই দুয়ের মধ্যে আমি কোন সংযোগ স্থাপন করতে পারছি না। একালেও খ্যাতিমান বহু সাধক সাপ নিয়ে ভেল্কী দেখিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার এক অধ্যাপকের কাছে সাধক ও সাপের সম্পর্কের একটা গল্প শুনেছি। কলকতা

বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইতিহাস বিভাগের কোন অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত সাধক রামঠাকুরের শিষ্য। প্রায়ই তাঁর আশ্রমে যেতেন। একদিন আশ্রমে তাঁর ঘরে ঢুকতে যাবেন হঠাৎ ভেতরে উঁকি দিতেই চমকে উঠলেন। প্রকাণ্ড একটা কালো সাপ ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে আছে। ভয় পেয়ে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই সাপটি ধীর গতিতে বাইরে এসে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর সেই অধ্যাপকটি রামঠাকুরের ঘরে ঢুকলেন। ঠাকুর অসুস্থ ছিলেন। জ্বর। বললেন, ভয়ানক জ্বর হয়েছে, শরীরটা খারাপ। অধ্যাপক বললেন, কিন্তু আমি যে বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম ! সাপ। ঠাকুর বললেন, হ্যাঁরে। সাপটা আমাকে ভালবাসে। জ্বরটর হলে আমার কাছে আসে। শীতল শরীর দিয়ে আমাকে পেঁচিয়ে ধরে। এতে জ্বরের তাপ আমার কমে যায়। এই ত্যাখ্‌না, এখন অনেকটা ভাল বোধ করছি। রামঠাকুরের গল্প শুনে মনে হয়, বাইরের সাপও নিরাময়ের প্রতীক। গ্রীসে তাই সাপই ছিল আরোগ্যনিকেতনের অধীশ্বর। শুধু যে বাইরের ব্যাধিই দূর করে সাপ, তাই নয়, তন্ত্রের মতে বন্ধন-ব্যাধি দূর করে পরমাগতিও দান করে।

আশ্চর্য এই মানুষ আমরা, এত বড় একটা সত্য হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও তাকে আমরা ভয় করি। তার স্বরূপ জানবার চেষ্টা করি না। বাইরের সাপ ও ভেতরের সাপ তুইই আমাদের কাছে ভয়াবহ। বাইরের সাপে বিষের ভয়। ভেতরের সাপে বৈরাগ্যের ভয়। এসংসারে আধিব্যাধি যন্ত্রণা তো কম নেই। বৈরাগ্যে নাকি অমৃত লাভ করা যায়, এ বহুদিনের পুরানো কথা। অথচ বৈরাগী হতে সাহস করি আমরা ক'জন ? তুইয়ের প্রতিই আমাদের অনীহা। অথচ এক পা এগুলেই কপালে আমাদের কি লেখা আছে আমরা জানি না। যে বিদ্যা তা জানতে সাহায্য করে সে বিদ্যাকে আমরা এড়িয়ে চলি। সাপ হয়তো সেই ত্রিকালজ্ঞ দৃষ্টিই দিতে পারে। ত্রিকালজ্ঞ দৃষ্টির অধীশ্বর এমন এক অলৌকিক সর্পসাধকের কথা শুনেছিলাম স্বর্গীয় পরমেশ রায়ের মুখে। একসময় বার্মাশেলে বড় চাকুরি করতেন।

ম্যানেজার। ইংরেজীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ। কিন্তু বড় একগুঁয়ে ও রগচটা মেজাজের পরমেশদা। শেষ জীবনে তাঁর একগুঁয়েমীর জন্য পরিবার পরিজন ত্যাগ করে বেহালার এক জ্যোতিষাশ্রমে পড়ে থাকতেন। সেখান থেকেই পরমেশদার সঙ্গে আমার ভাব।

কি একটা সামান্য কথায় বার্মাশেলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পরমেশদা আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নতুন জীবিকার সন্ধানে ঘুরতে লাগলেন পথে পথে। কিন্তু কোথাও আর চাকরির সংস্থান হয় না। চাকরির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে দাঁড়িয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টো দিকে, কলেজ স্কোয়ারের এক কোণে মীর্জাপুর স্ট্রীটের গায়ে। দেখলেন আলুথালু একটা পাগল। গলায় একটা সাপ ঝোলানো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কি বলছে! হঠাৎ হে হে করে হেসে উঠে বলল, ছ্যাখ, ছ্যাখ, লোকটা এখনই মরবে, তা জানে না। মানুষের কি দুর্ভাগ্য! পরমেশদার প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েই পাগলা এই কথা বলছিল। ঠিক তক্ষুনি পরমেশদা দেখতে পেলেন যে, একটা লোক রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ল। চৈতন্য হল পরমেশদার। বুঝলেন, এ পাগল যে-সে পাগল নয়। পাশে ফিরে তাকাতেই দেখলেন পাগলটা হাসছে। সাপটাকে হাতে নিয়ে সে পরমেশদার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল. সাপ, সাপ, বুঝলি, সবই সাপের খেলা। ভেতরে সাপ আছে তাকে জাগাতে না পারলে মানুষের অতীত ভবিষ্যৎ সবই অন্ধকার। বর্তমানও যন্ত্রণা-দায়ক। কি রে, এ্যাঁ! পরমেশদাকে লক্ষ্য করে সে বলল, 'তুই যেমন যন্ত্রণায় ভুগছিস। অথচ কাল কি হবে জানিস না, তাই না?' পাগল হে হে হে হে করে হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল। পরমেশদা যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ। সংবিৎ ফিরতেই পাগলটাকে ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জনারণ্যে কোথায় সে হাওয়া হয়ে গেছে, আর তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

পরমেশদা আরও কিছুদিন হন্যে হয়ে ঘুরলেন চাকরির সন্ধানে

কিন্তু কোথাও কোন আশার আলো পেলেন না। আবার একদিন হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালেন সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে; মীর্জাপুর স্ট্রীটের ধারে, কলেজ স্কোয়ারের পাশে। দাঁড়াতেই সেই পাগলটাকে দেখতে পেলেন। পাগলটা পথের ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে পরমেশদার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিরে! ভেবে ভেবে সারা হলি তো! পেলি কোন হদিস? আজ কি হবে জানিস? এ্যাঁ! ভেতরের সাপকে জাগা, ক্রিমিকীটের মত জীবন নিয়ে কি হবে র‍্যা? যা যা হয়ে যাবে, আজই হয়ে যাবে।' পরমেশদা রাস্তা অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কোথা থেকে দুটো গাড়ি এসে বাধার প্রাচীর তুলে দাঁড়াল। গাড়ি দুটো চলে গেলে ওপারে গিয়ে তিনি যখন উঠলেন, তখন পাগল নেই। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও তাঁর হদিস পাওয়া গেল না। পরমেশদা একটা ভারি মন নিয়ে ফিরতে লাগলেন। পাগল বলেছিল, 'আজই হয়ে যাবে।' 'আজই কি হবে'? পরমেশদা কিছুই অনুমান করতে পারলেন না। 'হয়ে যাবে'-র নানা রকম অর্থ হয়। ইহলোক থেকে পঞ্চত্ব পাওয়াও একধরনের 'হয়ে যাওয়া'। পরমেশদা মনের মধ্যে এক জটিল আবর্তে ঘুরতে লাগলেন যেন। সামান্য এই কথাটা তাঁর মধ্যে কোন আলোড়ন আনতে পারতো না হয়তো, কিন্তু কিছুদিন আগেই পাগলের ব্রহ্মবাক্যের যে পরিচয় তিনি পেয়েছেন সে-কথা স্মরণ হতেই মনের মধ্যে অশান্তি বোধ করতে লাগলেন।

পরমেশদা তখন থাকতেন দক্ষিণ কলকাতা। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা দেশপ্রিয় পার্কের উল্টো দিকের পথ ধরে রাসবিহারী এভিনিউ-এর দিকে হাঁটছেন। হঠাৎ লেক মার্কেটের কাছে দক্ষিণ-কলকাতার এক কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা। তিনি পরমেশদাকে লক্ষ্য করে বললেন, এই যে পরমেশ, কেমন আছ?

প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গিতে পরমেশদা উত্তর দিলেন, আছি একরকম দাদা।

—কি করছ এখন?

—কিছু না দাদা। বেকার।

—সেকি ! তুমি বার্মাশেলে কাজ করতে না ?

পরমেশদা বললেন, হ্যাঁ, বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছি।

—তাহলে ! সংসার চলবে কি করে ?

—ভাবছি দাদা। চাকরির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—আচ্ছা তুমি ইংরেজীতে এম. এ. না পরমেশ ?

পরমেশদা বললেন. হ্যাঁ !

—এস তো তুমি আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

—এই কাছেই আমার বাসা। চল।

পরমেশদাকে প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে এলেন অধ্যক্ষ মশাই। তারপর বাড়িতে এনে বললেন, এক্ষুনি একটা দরখাস্ত কর।

পরমেশদা বললেন. কোথায় ?

—আমার কলেজে।

—কোন পোস্ট খালি আছে নাকি ?

—আছে। কালই একবার এসে দেখা কর।

পরমেশদা দরখাস্ত লিখে দিলেন। এবং পরদিন কলেজে গিয়ে দেখা করতে সেদিনই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে গেলেন। পরমেশদার পক্ষে সে পাগল যথার্থ ই অলৌকিক পাগল সন্দেহ নেই।

সত্যিই তো, আমরা পার্থিব মানুষেরা কি এক মহা অনিশ্চয়তার মধ্যেই না জীবনযাপন করি ! জন্মের পূর্বের অতীত তো আমাদের কাছে অন্ধকারই, এ-জন্মের বহু অতীত স্মৃতিও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আর ভবিষ্যৎ ? এক মিনিটের ভবিষ্যৎও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তবুও যে কি নিয়ে, কি বিশ্বাসে আমরা বেঁচে থাকি কে জানে ! কেন যে তবু আমরা জীবনের অর্থ খুঁজবার চেষ্টা করি না কে বলবে ! আমার নিজের জীবনেই তো আমি কত রহস্যময় ভবিষ্যতের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমার দুটি কর্মক্ষেত্রের চাকরিই চমকপ্রদ।

প্রথম চাকরি করি হাওড়ার এক কলেজে। এম. এ. পাশ করে বসে আছি। বিভিন্ন কলেজে দরখাস্তের পর পর দরখাস্ত করছি।

কোথা থেকেও কোন সাড়া নেই। মাস-দুয়েক এমন করে বসে আছি হঠাৎ একদিন স্নান করছি এমন সময় আমাদের পাড়ার একটি লোক অপরিচিত এক ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এল। হন্যে হয়ে সে লোকটা আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্নান সেরে এসে তার সঙ্গে কথা বললাম। হাওড়ার সেই কলেজের সেক্রেটারী বাহক মারফৎ আমার ইন্টারভিউ পত্র পাঠিয়েছেন। একেবারে অবিশ্বাস্য ঘটনা। পত্রবাহক বলল, আজ বিকেলেই দেখা করবেন।

চার বছর সেই কলেজে কাজ করেছি। সেখানে আমার বিষয়ে অনার্স খুলেছি। অথচ হঠাৎ সপ্তাহ শেষে শনিবার কলকাতায় আসার দিন দেখলাম আমার ডিপার্টমেন্টে আমারই উপর একজনকে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকে এজন্য আমাকে বিদ্রূপ করতেও ছাড়লেন না। মনে মনে ব্যথা পেলাম। অবশ্য এর আগেই কলকাতায় যাবার জন্য চেষ্টা করছিলাম। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছিল। কলকাতার খুব কাছেই আমার বর্তমান কলেজ। তখন কেবল খুলবে। সেখানেও একটা আবেদন পত্র দিয়েছিলাম। কিন্তু কোন জবাব পাইনি। আবেদন পত্রটি আমার এক সমাজসেবী বন্ধু স্থানীয় এম. এল. এ ও কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্টের হাতে দিয়েছিলেন। তিনি সেটা দেন প্রেসিডেন্টের হাতে। আমি হাওড়া থেকে কলকাতা ফিরি শনিবার। ফিরে যাই সোমবার। রবিবারই নতুন কলেজের ইন্টারভিউ। কিন্তু ইন্টারভিউতে আমার ডাক পড়েনি। অধ্যক্ষ সাহেব আমাকে ডাকেন নি। এবং কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্টকেও ইন্টারভিউতে উপস্থিত থাকতে বলেন নি। ভাইস প্রেসিডেন্ট যাচ্ছিলেন কলেজের পাশ দিয়ে একটি মিটিং-এ। হঠাৎ কলেজের গেটে ভিড় থেকে কৌতূহলী হয়ে নেমে পড়লেন। ভিড়ের কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি জানতে পারলেন যে, কলেজের অধ্যাপকদের জন্য ইন্টারভিউ হচ্ছে। তিনি সরাসরি ইন্টারভিউ-এর ঘরে চলে গেলেন এবং খোঁজ করলেন যে আমাকে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছে কি না। দেখা গেল আমন্ত্রিত প্রার্থীদের মধ্যে আমার নাম নেই। তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, তাঁ

প্রার্থীকে ডাকা হয়নি কেন? প্রার্থীর অর্থাৎ আমার কি শিক্ষাগত যোগ্যতা কম? অধ্যক্ষ একটা সাধারণ অজুহাত দেখালেন: আমার হাতের লেখা খারাপ। সে অজুহাত টিকল না। আমাকে ইণ্টারভিউ না দিয়ে অন্য প্রার্থীকে যেন নিয়োগ পত্র না দেওয়া হয় ভাইস প্রেসিডেণ্ট এই অনুরোধ করলেন। ফলে পরদিনই অর্থাৎ সোমবার আমার ইণ্টারভিউ নেওয়া স্থির হল। সোমবার ভোরবেলা আমি বেরিয়ে যাই হাওড়ায়। কিন্তু বেরুবার দিন আমার হল জ্বর। যেতে পারলাম না। সকাল আটটা নাগাদ ভাইস প্রেসিডেণ্টের লোক এসে আমাকে জানালেন, 'আজ তোমার ইণ্টারভিউ সন্ধ্যা সাতটায়। তৈরি থেকো। আমি এসে নিয়ে যাব।' আমার যদি জ্বর না হত, লোকটি আমার দেখা পেতেন না। আমারও আর ইণ্টারভিউ দেওয়া হয়ে উঠত না। বর্তমানে যেখানে চাকরি করি তা হত না। অসুস্থ শরীর নিয়েই ইণ্টারভিউ দিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। আমার অভিজ্ঞতা কাজে লাগল। আমিই নির্বাচিত হলাম। এবং তৎক্ষণাৎই হাতে হাতে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেলাম। পরদিনই যোগদান করতে হবে কাজে। তাই করেছিলাম।

এই প্রসঙ্গেই আরো এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছিল আমার এক বন্ধুর জীবনে। নিউ আলিপুরের মোড়ে এক পাগলকে হাত দেখাতে গিয়েছিলাম। পাগল আমাদের জীবনে দু'জনকেই দুটো ঘটনার তারিখ বলে দিয়েছিলেন পূর্বাহ্নেই। আশ্চর্যভাবে সেই তারিখই সত্য হল। বন্ধুটিকে বলেছিলেন, তুমি অধ্যাপক হবে। অমুক দিনে এতটার সময় নিয়োগপত্র পাবে। হলও তাই। আমি হাওড়ার কলেজে পদত্যাগ পত্র পেশ করতেই সেক্রেটারী বললেন, যাবেন না। আপনার উপরে কাউকে বসানো হয়নি। নতুন লোক আনা হয়েছে ভাইস প্রিন্সিপাল করা হবে তাই। আর তা ছাড়া, আপনাকে সিনিয়র স্কেল দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু আমি বললাম, কলকাতার কাছে যখন পেয়েছি, ফিরে আর যাব না। আমাকে ছেড়ে দিন। সেক্রেটারী বললেন, ছাড়ব, তবে আপনার বদলে একজন লোক দিয়ে গেলে তবে। আপনি যাকে দেবেন,

তাকেই নেব। আমি গেলাম বন্ধুটির কাছে। তিনি তখন বেহালার এক বিদ্যাপীঠে কাজ করেন। গিয়ে বললাম, আজকেই আপনার অ্যাপয়েন্টমেণ্ট হবে অধ্যাপক হিসেবে। একথা শুনে তিনি যেন অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। কিন্তু আমি যখন সন্ধ্যাবেলায় তাঁকে আমার সেই আগের কলেজের সেক্রেটারীর বাড়িতে নিয়ে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁকে নিয়োগপত্র দিয়ে দিলেন। সেই পাগলটি যে নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের কথা বলেছিল—দেখা গেল ঠিক সেই সময়েই এবং সেই তারিখেই ঘটনাটি ঘটেছে। জীবনের এক মিনিট পরের ঘটনা আমরা বলতে পারি না বটে, তবে কেউ কেউ পারেন। তবে শুধুমাত্র মিনিট নয়। মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর। এমনকি যুগ-যুগান্তর ধরে কি ঘটবে তাও অনেকে বলতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন ভবিতব্য। নিজের জীবনের বহুদূর অতীতের কথাও তিনি জানতেন। এই জানাতেই জীবনের সার্থকতা। না হলে জলের বুকে বুদ্‌বুদের মত এ-জীবন বড় যন্ত্রণার। জীবনের উদ্দেশ্যই জীবনের অর্থকে জানা। এইজন্যই ক্রমবিবর্তনে প্রথম ইউনিসেলুলার প্রাণ মাল্টিসেলুলার হয়েছে, প্রাণের পরিণতি মানুষের বুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে। এই বুদ্ধির দ্বারাই পেতে হবে প্রাণের উৎসের সন্ধান, জীবনের অর্থের সন্ধান। ঐশ্বর্যের মূল্য কি? প্রতিপত্তিরই বা মূল্য কি—যদি মৃত্যুর ভয়ে আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি! সক্রেটিস হাসি মুখে হেমলক বিষ পান করেছিলেন। জানি না, জীবনের পরমতত্ত্ব করায়ত্ত করে তিনি যথার্থই ত্রিকালজ্ঞ হতে পেরেছিলেন কিনা। কেউ বা একটা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আত্মদানে পরাঙ্মুখ হয় না। কেউ বা উন্মাদনাতেও মৃত্যু-ভয়কে অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু যথার্থ মৃত্যু বা মৃত্যুভয়কে কি তাতেই জয় করা যায়? মৈত্রেয়ী বশিষ্ঠের কাছে যে অমৃতের সন্ধান চেয়ে মৃত্যুভয় রহিত অনন্ত আনন্দলোকের সন্ধান পেতে চেয়েছিলেন আত্মজ্ঞান না হলে সে অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই আত্মজ্ঞান কিভাবে সম্ভব? সেই 'আত্মানং বিদ্ধি' কিভাবে সম্ভব? ত্রিকালজ্ঞ হয়ে কিভাবে পেতে পারি জীবনের

সার্থকতা ! জ্ঞান, ভক্তি সবই যেন আমার পন্থা হিসেবে বাতিল হয়ে গেছে। আমার মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু সাপ, সাপ আর সাপ। সাপই নাকি দিতে পারে সেই অমৃত জীবনের স্বাদ। কালভুজঙ্গ বিষধরের মধ্যেই নাকি লুকিয়ে আছে অমৃত। বিষ পান করেই নীলকণ্ঠ শিব অমর, মৃত্যুর অধিপতি। লয়ের কর্তা। এই সাপের যথার্থ রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে। হিমালয়ের তুধচটির পথে যে বিষয়ের সামান্য মাত্র সত্য আমি জানতে পেরেছিলাম, তার বাকী অংশ জানার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সর্করিগোলির বাঙালী বাবার আশ্রমে। এ সুযোগ আমি ত্যাগ করব না।

পাহাড় থেকে নেমে সমতল ভূমিতে পা দিতেই দেখলাম সন্ধ্যা গাঢ় হয়েছে। পাহাড়ী অরণ্য নিবিড় ছায়ায় ঘন হয়ে যেন জমাট বেঁধেছে। রুক্ষ মৃত্তিকার উপর বাবলা বনের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে হতে গাঢ় ছায়ায় মিলিয়ে গেছে। উত্তর দিক থেকে হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে বটে তবে কামড়ানো শীতের আমেজ নেই। ছায়া যেন স্নিগ্ধ। যেন গ্রীষ্মের দীঘির জল। এ ধরনের স্নিগ্ধ ছায়াই আমি দেখে এসেছি বাঙালী তরুণ সাধুটির চোখের মণিতে। সর্পরহস্যের নতুন ইঙ্গিত তিনি আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু সে ইঙ্গিত আমার কাছে অস্পষ্ট। তুধচটির পথের ধারের সেই সন্ন্যাসীটিও আমাকে একটি সংস্কৃত শ্লোক বলেছিলেন। সেই শ্লোক আমি ছোটবেলায় আমার গাঁয়ের স্কুলের পণ্ডিতমশাইয়ের কাছেও শুনেছিলাম। তুধচটির সাধুটি বলেছিলেন

> তন্মধ্যে বিসতন্তুসোদরলসৎ সূক্ষ্মা জগন্মোহিনী
> ব্রহ্মদ্বারমুখং মুখেন মধুরং সংছাদয়ন্তী স্বয়ম্।
> শঙ্খাবর্ত্তানিভা নবীনচপলামালাবিলাসাস্পদা
> সুপ্তা সর্পসমা শিবোপরিলসৎসার্দ্ধত্রিবৃত্তাকৃতিঃ ॥

তরুণ সাধুটি বললেন :

> লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পীত্বা পুনঃ কুণ্ডলী
> নিত্যানন্দমহোদয়াৎ কুলপথান্মূলে বিশেৎ সুন্দরী

তদ্দিব্যামৃত ধারয়াস্থিরমতিঃ সন্তর্পয়ে দৈবতং
যোগী যোগপরম্পরাবিদিতয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডস্থিতম্॥

সংস্কৃতে আমার দুর্বলতার জন্য দুটি শ্লোকই আমার কাছে দুর্বোধ্য। কি ইঙ্গিত আছে এ শ্লোকে কে জানে। অর্থ ধরলেও কি এর ইঙ্গিত ধরা যাবে? দেহতত্ত্বের গানের অর্থ ধরা পড়লেও কি এর মর্মার্থ ধরা পড়ে? গুহ্যবিদ্যা না শিখলে গুহ্য সাধনার ধারা ধরা পড়ে না। এই রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করতেই হবে।

ময়ূরের কেকা প্রলাপের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা নামল সুখসেনার বুকে। অতীন্দ্রিয় জগতের ছায়া আকাশে। কিন্তু মর্ত্যে মানুষ সেই ছায়ার কোন স্পর্শ অনুভব করে কি না কে জানে। জনজীবনে এখানে দেখছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ততা। পরনিন্দা, পরচর্চা, আত্মস্বার্থ সন্ধানের চেষ্টা। মূর্খ ও পণ্ডিতে এখানে ভেদ নেই। পার্থিব বিষের জ্বালায় এরা উন্মাদ। অবশ্য কেউ কেউ বা জীবনের অর্থ ধরতে পেরে অমৃত পানে আত্মভোলা। আমারই মত সামান্য কিছু লোক আছে, যারা না ঘরকা, না ঘাটকা। মূর্খ বুঝি জীবনে আমরাই। এপারটাকেও সবটা ধরতে পারিনি, ওপারকেও বুঝতে পারিনি। ওমর খৈয়ামের বিদ্রূপের পাত্র বুঝি আমরাই : মূর্খ তোদের একূল কূল ডুবল ঘূর্ণিপাকে।

পাহাড়ের নিচে সুখসেনায় রাত নামে অদ্ভুতভাবে। শহর জীবনের বাসিন্দা কোন মানুষ এখানকার রাতের কোন তাৎপর্য বুঝতে পারবে না। চুপ করে কান পেতে থাকলে এখানে বোধহয় নিঝুম রাতে অনাদি কালের হৃদস্পন্দন শোনা যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে আমি রাত্রির সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে যেন অনাদি অতীতে হৃদয় পেতে দিয়ে জগৎ রহস্যের মর্মোদ্ধার করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এমনি নিস্তব্ধ অন্ধকারে একাকী কোন সাধক বোধহয় আত্মরহস্য চিন্তা করতে করতে ঋগ্বেদে নাসদীয় সূক্তের সন্ধান পেয়েছিলেন। অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকারের বুকে ঢেউ তুলে যেন একের পর এক রহস্য আছড়ে পড়ছে। আর আমার চেতনা তার বর্তমান স্তর থেকে সুদূর অতীতে

ছড়িয়ে পড়ছে। কত রহস্যময় অদৃশ্য ভাবনা ভাবতে ভাবতে আমি কখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। চেতনা কখন সচেতন মনের প্রহরা এড়িয়ে গিয়েছিল কে জানে! আমার অজ্ঞাতেই আমি এক রহস্যময় জগতে বিচরণ করতে লাগলাম যেন। দেখলাম—দেখলাম ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি এক প্রান্তর। ইতস্ততঃ নরকঙ্কাল ও হাড়গোড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে মাঝে মাঝেই শেয়াল ডেকে উঠছে। অদ্ভুত কিছু শ্বাপদ রাত্রিতে সেখানে বিচরণ করছে। অন্ধকার পাতলা। প্রদোষের মত। উলঙ্গ প্রৌঢ় কে একটা লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হাতের বাহুতেও রুদ্রাক্ষের মালা। আসতে আসতে আমার কাছে এসে বসল লোকটি। লোকটির গায়ে ধূপ পোড়ানো সুন্দর গন্ধ। সস্নেহে আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, চাদর খোল্। কাপড়ের কসি আল্গা করে দে।

আমি তার কথা মত কাজ করলুম। তিনি আমার মেরুদণ্ডে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে গাঁটে গাঁটে কি যেন দেখতে লাগলেন। যেন আমার দেহের অভ্যন্তরে কোথায় সাপ আছে তাই খোঁজ করতে লাগলেন। তাঁর হাতের স্পর্শে অদ্ভুত একটা বিদ্যুতের চমক। হাত বুলাতে বুলাতে যেখানে আমার মেরুদণ্ডের শেষ, একেবারে সেখানে হাতখানা এনে ভাল করে কি খুঁজে দেখলেন। তারপর বললেন, 'ছ্যাখ্, আমি বলে যাই, তুই দেখে নে। তাহলে সব বুঝতে পারবি।'

তাঁর স্পর্শ পেয়ে আমার জৈবদেহের সামান্য চঞ্চলতা মুহূর্তের মধ্যে যেন স্থির হয়ে গেল। শিরদাঁড়ার নিচে শেষ গাঁটটা সজোরে টিপে দিয়েই তিনি যেন চিৎকার করে উঠলেন: র‍্যা শালা, সে কাজ সে তোর হয়ে গেছে। উঃ! তবে ঘুর ঘুর করে মরছিস কেনে র‍্যা! শালা সাপ খুঁজছিস নিজের মধ্যে সাপ লুকিয়ে রেখে!

শিরদাঁড়ার সবচেয়ে নিচের গাঁটে খুব জোরে আর একবার একটা টোকা মেরে তিনি বললেন, শালা জানিস তো এর নাম কি?

সসঙ্কোচে বললাম, আজ্ঞে না।

—এর নাম······

তিনি কি বললেন তা শুনবার আগেই দেখি একটা প্রকাণ্ড ফণাধর সাপ ফোঁস করে উঠেছে। তার এত বড় ফণা যে, কী বলব! প্রাণভয়ে উঠে দৌড়ুতে লাগলুম। সেই প্রৌঢ় উলঙ্গ লোকটি হাততালি দিয়ে উঠল: গ্যাখ, শালা সাপ খুঁজতে এসে সাপের ভয়ে পালাচ্ছে। আরে শালা পালাবি কোথায়? সাপ তোকে ছাড়লে তো!

যত দৌড়োই দেখি সেই সাপ। যেন আকাশ আচ্ছন্ন করে ফণা তুলে আছে। সেই ফণার ছায়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার কোন উপায়ই নেই। আমি অর্ধচেতন হয়ে পড়ে গেলাম। কয়েকটা কাক সেই মুহূর্তে আমার উপর দিয়ে কা কা করতে করতে চলে গেল। কয়েকটা খরগোশ দৌড়ে পালাল। একটা শেয়াল উঁকি দিয়ে দেখছিল ঝোপের আড়াল থেকে। আবার সে লুকিয়ে পড়ল। কিছু লোক ধরাধরি করে কি একটা জিনিস নিয়ে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। ক্রমশঃ সব কিছু প্রচণ্ডভাবে ঝাপসা হয়ে এল আমার চোখে। অনেকক্ষণ কোন কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর মনে হল কয়েকটা লোক আমার মাথার কাছে একটা অমৃতকুম্ভ নিয়ে বসে আছে।

কে একজন বলল, 'ওকে একটু অমৃত দাও গো। আহাঃ! বড্ড ভয় পেয়েছে।' সে অমৃতকুম্ভটা নিয়ে আমার আরো কাছে সরে এল। এমন সময় আর একজন বলল, অমৃতকুম্ভ নিয়ে ওর কাছে গিয়ে কি হবে? অমৃতকুম্ভ ওর দেহের মধ্যেই আছে।

—তাহলে ও তার সন্ধান পাচ্ছে না কেন?

—একটা নাগিনী যে তাকে ঘিরে রেখেছে।

—কি রকম?

—তিনি 'বিষকুম্ভপয়োমুখ' নন, 'বিষমুখপয়োকুম্ভ' তার দংশনে প্রাথমিক স্তরে জ্বালা। কিন্তু পরবর্তী স্তরে সুধা।

—ও তাকে দেখতে পাচ্ছে না কেন?

—ওযে লোকচক্ষু দিয়ে তাকে দেখতে চায়। কিন্তু লোকচক্ষুতে

তাকে যে দেখা যায় না। দেহ ব্যবচ্ছেদ করলেও এর কোন হদিস মেলে না।

—তাহলে এর উপস্থিতি জানা যাবে কি করে?

—শুধুমাত্র অনুভূতিতে ও উপলব্ধিতে।

লোকগুলো অমৃতভাণ্ড নিয়ে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল। আমার তখন তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছিল। আমি চেঁচিয়ে বলতে চাইলাম —ওগো, তোমরা যেও না। দু-ফোঁটা অমৃত দিয়ে যাও। কথা বলবার জন্য যেই মুখ খুলেছি, অমনি একটা সাপ মুখ থেকে বেরিয়ে আমার বালিশের নিচে ঢুকে গেল। আমি আপ্রাণ চেষ্টায় দুহাতে সেই সাপটাকে ধরতে গেলাম। এবার আর সাপকে ভয় নেই।

বালিশের নিচে হাত দিতেই কিসের একটা স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলাম। কয়েক টুক্‌রো শুকনো কাগজ যেন ফড়ফড় করে উঠল। এবং এবার যথার্থই আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে দেখি, আশ্চর্য! স্বপ্নের নেশায় সত্যি সত্যি বালিশের নিচে হাত দিয়ে আছি। এবং সত্যিই আমার হাতের আঙুলের ডগায় কয়েক পাতা কাগজ। বালিশটা তুলে দেখলাম সত্যি একটা পুরানো বইয়ের কিছু সংখ্যক পাতা। রাত্রির অন্ধকার তখন আর নেই। ভোরই হয়ে গেছে। কৌতূহল বশতঃ সেই পাতা কয়টা চোখের সামনে তুলে ধরলাম। আশ্চর্য! প্রাথম যে শব্দটা চোখে পড়ল, তা 'সাপ'। স্বপ্ন ও বাস্তবে একি যোগাযোগ! আমি পাতা কয়টি নিয়ে বাইরের আরও স্পষ্ট আলোতে এলাম। পড়তে গিয়ে সত্যি অবাক হলাম। কার লেখা বই কে জানে! কবেকার লেখা বই কে বলবে। কী যে নাম ছিল বইয়ের বোঝার উপায় নেই। কয়েকটা পাতার মধ্যে সত্যি সত্যি সাপের ইতিহাস লেখা আছে। পৃথিবীতে সর্পপূজার এক বিস্তৃত পরিমণ্ডলের উল্লেখ রয়েছে সেখানে। এ ইতিহাস আমাকে কোন্ ইঙ্গিত দেবে কে জানে! আমি সাগ্রহে পাতা কয়টি পড়লাম। লেখকের বক্তব্য এই ধরনের: বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে তুষ্ট করবার প্রাথমিক পর্যায়ে এই পৃথিবীতে সর্পপূজার প্রচলন হয়েছিল। প্রাচীন

পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যতার কেন্দ্রে সর্প উপাসনা ব্যাপকভাবে একদিন প্রচলিত ছিল। নানা কিংবদন্তী, পৌরাণিক কাহিনী ও গাঁথার মধ্য দিয়ে আজও সেই সব কাহিনীর রেশ রয়ে গেছে। বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে আজও সর্পপূজার অস্তিত্ব উপস্থিত।

সর্পপূজার প্রচলন হয়েছিল কেন? সেকি সর্পভীতি থেকে? এ রহস্যের স্পষ্ট জবাব আজও মেলেনি। কিন্তু সর্পপূজা হত সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য। সর্প ছিল সুখ সমৃদ্ধির প্রতীক। কোথাও বা সর্পপূজা হত প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসেবে। আকাশে বিদ্যুতের রেখার সঙ্গে সর্পের তির্যক গতির মিল আছে। সেজন্য তাকে ঊর্ধ্ব আকাশের কোন শক্তি হিসেবেও হয়তো মনে করা হত। তা যে-কারণেই হোক না কেন, প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্রই একসময় সর্পপূজার প্রচলন ছিল। কেউ কেউ মনে করেন কোথাও এই পূজার একটি কেন্দ্রস্থল ছিল। সেখান থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা দেশে এই পূজা-পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে সে কেন্দ্রস্থান ছিল কোথায়, কেউ তা স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি। কেউ কেউ মনে করেন মধ্যপ্রাচ্যে ইউফ্রেতিস নদীর অববাহিকায় প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম সর্পপূজার উদ্ভব হয়েছিল। এ জনগোষ্ঠী ছিল আর্য বা মধ্যপ্রাচ্যের সেমেটিক জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এদের কাছ থেকেই পৃথিবী সর্পপূজার পদ্ধতি শিখে নেয়, যেমন পারস্য থেকে একদিন ভারতবর্ষে সর্পপূজার প্রচলন হয়েছিল। গ্রীক ও রোমান লেখকদের বিবরণীতে নানা ধরনের সর্পপূজা পদ্ধতির বর্ণনা আছে। এই সভ্যতাভুক্ত অঞ্চল থেকে নানা কিংবদন্তী ও শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাচীন মিশরীয়দের রাজমুকুটে ভ্রূযুগলের মাঝখানে শোভা পেত সর্পপ্রতীক। ডিডোরাসের বর্ণনাতে আছে—মেসোপোটেমিয়ার বেলাসের বিখ্যাত মন্দিরে 'রিয়া' দেবতার মূর্তির সঙ্গে ছিল দুটি রৌপ্য নির্মিত সর্পমূর্তি। রোমের জুনো দেবতা সাপের মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। গ্রীক পুরাণে এক সময় সর্প ধ্বংসের কাহিনী পাওয়া গেলেও পরবর্তীকালে গ্রীসের লোকেরা

সাপকে দেখত দৈববাণীর রক্ষক হিসেবে। গ্রীক দেবতা অ্যাপোলো সেই সাপকে হত্যা করে দৈববাণী উদ্ধার করেন।

জনশ্রুতি থেকে প্রাচীন রোমে যে সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল তা জানা যায়। ঈলিয়ানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, রোমের ষোল মাইল দক্ষিণে একটি বিশাল ও ঘন বনের মধ্যে এক দেবীমন্দির ছিল। সেখানে গভীর গুহায় এক বিশালকায় সাপ বাস করত। পার্শ্ববর্তী দেশের মেয়েদের সেখানে আনা হত সতীত্ব পরীক্ষা করবার জন্য। ঐ সর্পদেবতা যদি কুমারীদের দেওয়া নৈবেদ্য গ্রহণ করতেন তবেই মনে করা হোত যে তাদের সতীত্ব নষ্ট হয়নি।

এপিরাসের দৈববাণীতেও সাপের কাহিনীর উল্লেখ আছে। প্রাচীর বেষ্টিত একটি বৃত্তাকার বৃক্ষকুঞ্জে পবিত্র সর্পকুল বাস করত। এই সাপগুলি ছিল গ্রীসের ডেলফির অজগরের বংশধর। অ্যাপোলো দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত ছিল এরা। বৎসরের কোন এক নির্দিষ্ট দিনে সর্পপূজার উৎসব হত। সেই উৎসবের দিনে এক কুমারী মেয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সাপেদের খাবার নিয়ে সেই কুঞ্জে ঢুকত। সাপেরা যদি সেই খাদ্য গ্রহণ করত তাহলে মনে করা হোত যে, পরের বছর দেশে ভাল শস্য হবে। দেশ ধনধান্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে। খাবার না খেলেই অন্ধকার ভবিষ্যতের আশঙ্কা করা হত।

প্রাচীন ভারত এবং তার পার্শ্ববর্তী জনপদগুলিতেও একসময় সর্প-পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে দ্রাবিড় ও আর্যদের মধ্যে সর্পপূজার প্রচলন ছিল জানা গেলেও ব্যাপকভাবে তা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না। সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল নাগপূজক এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে—যারা উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে মধ্যভারতের অমরাবতী পর্যন্ত বসতি বিস্তার করেছিল। কালক্রমে এদের সঙ্গে আর্য ও দ্রাবিড়দের সংমিশ্রণ ঘটে। তারপরই ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে সর্পপূজার প্রচলন হয়। তবে সর্পপূজক গোষ্ঠীর বিরোধী পক্ষও প্রবল ছিল। এই দুই বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ আছে।

মহাভারতে নাগমাতা কদ্রু ও গরুড়মাতা বিনতার মধ্যে কলহের বিবরণ আছে। খাণ্ডববন দাহনে নাগপূজক জনগোষ্ঠী পরাজিত হয়েছিল বলে মনে হয়। অপর দিকে নাগরাজ তক্ষক পরীক্ষিতকে হত্যা করে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় আবার এর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন সর্পযজ্ঞ করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি আস্তিক মুনির জন্য।

লেখকের ধারণা, গৌতমবুদ্ধ কৃচ্ছ্রসাধনার পথ পরিত্যাগ করে পরবর্তীকালে আহারপুষ্ট কায়সাধনায় মন দিয়েছিলেন এবং তাতেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। দেহকে কষ্ট দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্যা ছিল আর্যদের। আহারপুষ্ট কায়সাধনা সর্পপূজক জনগোষ্ঠীর। তাদের রহস্য-পূর্ণ সাধনার ধারাই সূক্ষ্ম তন্ত্র-সাধনার মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী সাধনার মৌল রূপ।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্কটের দিনে নাগবিদর্ভ জনপদের নাগবংশীয় এক তরুণ দার্শনিকই গৌতমবুদ্ধ প্রচারিত ধর্মমতের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর নাম নাগার্জুন। নাগার্জুন মনে করতেন যে, গৌতম বুদ্ধের জীবিতকালে নাগেরা তাঁর বাণী শুনে লিপিবদ্ধ করে তা গুহায় লুকিয়ে রেখেছিল। নাগার্জুন সেই লিপিগুলি উদ্ধার করে নাগদের নির্দেশে বিশ্বে সেই ধর্মমত প্রচারের জন্য অগ্রসর হয়েছেন। নাগ প্রভাবেই বৌদ্ধধর্মে মহাযান মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল নাগেদের জন্যই। এই মহাযান বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই নাগদের সূক্ষ্ম কায়সাধনা বিভিন্ন আকারে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সৃষ্টি করেছে। নাগপূজকেরা পিতৃপুরুষের সমাধির উপর সৌধ নির্মাণ করে পূজা করত। বৌদ্ধধর্মে সেইজন্যই স্তূপ-পূজার প্রচলন হয়। বৃক্ষ, চক্র ও ত্রিশূল ছিল নাগপূজকদের প্রতীক। বৌদ্ধ-ধর্মেও এ-সব ছিল। সাঁচী স্তূপের তোরণে বহু সাপের নিদর্শন রয়েছে। এমন এক মূর্তি আছে যাঁর মাথার উপর দেখা যায় সাত ফণাযুক্ত একটি সাপকে। তাঁর চারদিকে রয়েছে ফণাযুক্ত শিরোভূষণ নিয়ে কয়েকজন নারী। নৃত্যগীত, কামকলা ও সুরাপানের সমারোহও আছে। যার

সঙ্গে রয়েছে তন্ত্রসাধন পদ্ধতির প্রচুর সামঞ্জস্য। সুতরাং আজকে নয়, সাপ এসেছে সভ্যতার প্রথমে, সাপ থাকবে সভ্যতার অন্তিমে। সাপেই জাগরণ, সাপেই সিদ্ধি। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে সাপ ছাড়া অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে বড় আর কিছু নেই।

সর্প সম্পর্কিত এই কাহিনী কতটা ইতিহাস সমর্থিত, কতটা নাগজাতি সম্পর্কে, লেখকের ধারণা কতটা ইতিহাস প্রমাণিত আমি বলতে পারব না। কল্পনার আতিশয্য একটু বেশী আছে বলেও মনে হয়। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরও অভাব রয়েছে। তবে নতুন কোন ইঙ্গিত যে নেই তা নয়। স্থূল সর্প ও সূক্ষ্ম সর্পের মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টাও আছে এখানে। অর্থাৎ লেখক বলতে চান যে, সর্প-পূজার প্রথম পর্বে যদিও তার মধ্যে স্থূলতা থেকে থাকত, ক্রমবিবর্তনে তা সূক্ষ্মতা পেয়েছে। যে ইতিহাস মূক হয়ে আছে সে ইতিহাস কাব্যের মত অসীম ইঙ্গিতে ভরা। কল্পনাকে ক্ষতবিক্ষত করে তার উপর নানা মন্তব্য করা যায়। কিন্তু নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত কিছুই করা যায় না। স্থূল সর্পের মধ্যেই যে কিছু নেই, তাই বা বলব কি করে। তাহলে নানা যোগী পুরুষ কাঁধে সাপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কেন? ভড়ং দেখিয়ে পয়সা আদায় করার জন্য? কিন্তু সবাই তো তা করে না! সকরিগোলির প'হারীবাবার গুহায় সেই তন্ত্রসাধক অঘোরীবাবাকে পয়সার জন্য কৌশল প্রয়োগ করতে দেখিনি। রামঠাকুরের দেহে সাপ জড়িয়ে ধরেছিল লোককে বিভ্রান্ত করার জন্য নয়। স্থূল সাপ সূক্ষ্ম হতে পারে, কিন্তু স্থূলতার যে কোনই মূল্য নেই তাই বা বলবে কে? স্থূল সূক্ষ্ম সাপের যা-ই মূল্য হোক না কেন, আমার প্রশ্ন, আমি এমন অদ্ভুত স্বপ্নই বা দেখব কেন, এবং যথার্থ ই ঘুম ভেঙে আমার বালিশের নিচে সর্প সম্পর্কিত কয়েকটা ছেঁড়া পাতা পাব কেন? সম্পর্কটা কি নিতান্তই কাকতালীয়! আমার জ্যেঠামণি নানা ধর্মগ্রন্থ পড়তেন। হয়তো সর্প সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ তাঁর সংগ্রহশালায় ছিল। অবহেলায় সে গ্রন্থ আজ নষ্ট হয়েছে। তার কিছু অবশিষ্ট পাতা হয়তো কোন তাক থেকে উড়ে এসে আমার বিছানায় পড়ে থাকবে। আমার বিছানা

যে গুছিয়ে রেখেছিল সে হয়তো মূল্যবান কাগজ মনে করে পাতা কয়টি আমার বালিশের নিচে রেখে দিয়েছে। যে-করেই হোক পাতা কয়টি আমার উপাধানের নিচে এসেছে, হয় প্রাকৃত কোন হাতে, নয়তো অতিপ্রাকৃত কোন শক্তির নির্দেশে। সর্প নিয়ে আমার স্বপ্ন হয়তো সর্প সম্পর্কিত চিন্তার প্রতিফলন। না হয়তো অতিপ্রাকৃত কোন ইচ্ছার প্রভাব। তবে স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে এই রহস্যময় সামঞ্জস্য সত্যিই অবাক করে দেবার মত। আমার বিশ্লেষণী মন যতই এর বস্তুসম্মত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করুক না কেন, গভীর মন থেকে একটা অলৌকিকতার গন্ধই ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল, এরও কোন গভীর তাৎপর্য আছে, অধ্যাত্ম কোন গুহ্য ইঙ্গিত আছে। স্বপ্ন বিশ্লেষক যে কোন যোশেফই এর ব্যাখ্যা করতে পারে। ফ্রয়েডীয়রা একে টেনে আনবার চেষ্টা করবেন বাস্তব ঘটনায়। যোশেফ শ্রেণীর ব্যাখ্যাতা দেবেন যথার্থ ইঙ্গিত। আমি জানি বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ এ-সব ক্ষেত্রে আমাকে তৃপ্তি দিতে পারবে না। পরাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণই আমার প্রয়োজন। ভাগ্যক্রমে সকরিগোলির পাহাড়ে বাঙালী বাবার আশ্রমে আমি সেই পরাবিজ্ঞানসাধকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমার যেন বার বার মনে হতে লাগল, তাঁরই ঐশী শক্তির নির্দেশে আমার এই স্বপ্ন, এবং স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে এমন নিবিড় যোগাযোগ। এর একটা গুহ্য তাৎপর্য আছে। আছে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। সেই ইঙ্গিতের যথার্থ স্বরূপ ধরার জন্য আমার মনটা রীতিমত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

আট

স্বপ্ন দেখে সেই যে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, বালিশের নিচে সর্প সম্পর্কিত কাহিনীটি পেয়েছিলাম, তারপর থেকে আমি নিজেকে এতটুকু সুস্থির বোধ করিনি। আমরা মূর্খ, অন্ধ। কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। এই অজ্ঞতা ও অন্ধতা স্বীকার করাই

আমাদের পক্ষে ভাল। আমিও তাই নিজের মনে সেই স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যার আর বেশী চেষ্টা করলাম না। স্বপ্নটাকে আমি একটা দৈব নির্দেশ বলেই ধরে নিলাম। এবং ঠিক করলাম যে, সকরিগোলির তরুণ সাধুটির কাছ থেকেই এ স্বপ্নের তাৎপর্য বুঝে নেব।

শীতের দিন। সকাল আছে, বিকেল আছে, কিন্তু দুপুর নেই। বেলা দশটা অবধি হাওয়ায় জড়িয়ে থাকে ধূঁয়ার মত কুয়াশা। কুয়াশা কেটে সূর্য যখন ঝলমল করে জ্বলে উঠে তখনই দেখা যায় সে ঢলে পড়েছে। বস্তুতঃ সূর্য দক্ষিণ আকাশের গা ঘেঁষে এতটা নিচে নেমে থাকে যে, কার্তিক মাসের পর থেকেই বেলা একটু গড়ালেই মনে হয় বিকেল হয়েছে। সেদিন আমি যথার্থ বিকেলের অপেক্ষা না করেই বেলা দশটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে সকরিগোলি পাহাড়ে বাঙালী বাবার আশ্রম লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম।

মনের অবস্থার উপর পারিপার্শ্বিকেরও চরিত্র বদলায় এ-কথা অত্যন্ত সত্য। সেদিন অতিপরিচিত এই স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আমি কেন যেন একটা অপ্রাকৃত ছায়া অনুভব করতে লাগলাম। কোথাও উড়ন্ত পাখির একটু ছায়া নড়তে দেখলেই মনে হয় সাপ। গাছের ডাল হাওয়ায় একটু নড়ে উঠলেই মনে হল সাপ নড়ছে। মনে হল পাহাড়ের অরণ্যের নিচ দিয়ে সাপেদেরই খেলা চলেছে। জলস্রোত অজস্র সর্পেরই বঙ্কিম গতিতে এগিয়ে যাওয়ার ফল। মনে হতে লাগল আমার দেহের মধ্যেই বিদ্যুৎগতিতে একটা সাপ চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। সে-সব আমার বিকৃত মনেরই চিন্তা ছিল কিনা সেদিন, আজ আমি তা বলতে পারব না। কিংবা সে ছিল তন্ত্রসাধকের এক ধরনের অভিচার ক্রিয়ার ফল! চোখের দৃষ্টিতেও তন্ত্রসাধকেরা সাধারণ মানুষের মনোবিকলন ঘটাতে পারেন বলে শুনেছি। সন্দেহ নেই সেই তরুণ সাধকটি আমার উপর রীতিমত তাঁর ব্যক্তিত্বের ছায়া ফেলেছিলেন।

সুখসেনার বস্তি থেকে সকরিগোলির টিলা পাহাড়ের উপর দিয়ে বাঙালী বাবার মঠে যেতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে। মনের কৌতূহলের

তাড়নায় আমি বোধহয় সে-পথ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অতিক্রম করে গেলাম সেদিন।

টিলার উপর ওঠার পথের ধারে গাছগুলো এখানে আশ্চর্য সবুজ। যেন অদ্ভুত এক সচেতনতা নিয়ে মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকে! সেদিকে তাকিয়ে মনে হল, আমার অন্তরাত্মার সমস্ত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার কথা যেন তারা জেনে গেছে। যেন তারা নিশ্চিন্ত জানে, আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কি পাব। পাহাড়ের টিলার ঠিক কাছাকাছি এসেছি, পুরানো মঠ ছাড়িয়ে আলো ঝলমল নতুন মঠের দিকে উঠছি, এমন সময় দেখি একটা ঈগল পাখি শোঁশোঁ করে আকাশ থেকে নিচে নামছে, আমার বাঁ দিকে। বাঁ দিকে অনাবৃত শস্যক্ষেত দেখা যায়। মাটির নিচের একটা সাপ বোধহয় রোদ পোহাতে উঠেছিল বাব্‌লা গাছের নিচে। ঈগলটা সেইদিকে তাক করে নিচে নেমে গেল। কি হল বুঝতে পারলাম না। কিছুকাল পরে ঈগলটা আবার আকাশে উড়ল। তার পায়ের নখে কোন সাপ অসহায়ভাবে নেতিয়ে পড়ে নেই। আমার গন্তব্য স্থলে পৌঁছুবার ঠিক প্রাকমুহূর্তে এ ধরনের দৃশ্যের কী তাৎপয আছে বুঝবার চেষ্টা করলাম। কদ্রু-বিনতার দ্বন্দ্ব, বাসুকী-গরুড়ের দ্বন্দ্ব আজও শেষ হয়নি? সর্পের সঙ্গে ঈগলের এই খেলার তাৎপর্য কি? ঈগল কি দাম্ভিক অহংসর্বস্ব জীবাত্মার প্রতীক? সর্প কি পরমাত্মার ছায়া? ঈগল জয়লাভ করলে পরমাত্মা আত্মপ্রকাশে ব্যর্থ হন? উভয়ের দ্বন্দ্বের পর্যায় কি সাধকের সাধন সংগ্রামের পর্যায়? ঈগল যে সাপটাকে ধরতে পারল না এ ঘটনা কি আগে থাকতেই আমাকে কোন ইঙ্গিত দিল? আমি বিহ্বলভাবে নতুন মঠের প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি, সেই স্নিগ্ধ তরুণ সন্ন্যাসী বারান্দার পূব কোণে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে কারো অপেক্ষাতেই যেন বসে আছেন। আমাকে দেখে স্নিগ্ধ একটা হাসি হেসে বললেন, 'আসুন।' আমি কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলাম। কিন্তু তাঁর পায়ের কাছে বারান্দার মেঝেতে খড়িমাটির একটা আলপনা দেখে চমকে গেলাম। শুধু যে সাদা খড়িমাটি দিয়ে আঁকা তা নয়। রঙবেরঙের খড়িমাটি

দিয়ে তা রঙ করা। অনেক সময় যজ্ঞের আলপনাকে এইভাবে রঙ করা হয়। চিত্রটি এই ধরনের : একটি বৃত্তের চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে চারটি পাপড়ি। যেন একটি পদ্ম। রঙ গাঢ় লাল। এই পদ্মের কর্ণিকাতে রয়েছে হলুদ রঙের চতুষ্কোণ একটি ক্ষেত্র। চারদিকে আটটি শূলাকার চিহ্ন। ভেতরে একটি হাতীর ছবি আঁকা, যেন ঐরাবত। রয়েছে একটি ত্রিকোণ আঁকা। তার উপরে একটি শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের রঙ কচি কলাপাতার মত। সেই লিঙ্গকে সাড়ে তিন প্যাঁচে জড়িয়ে ধরে আছে একটি সাপ। আলপনার মধ্যে এক জায়গায় লেখা আছে লং এই শব্দটি। ল-এর মাথায় ডানদিকে রয়েছে রক্তবর্ণ চতুর্মুখ ও চতুর্ভুজ এক মূর্তি। পাশে একটি স্ত্রী মূর্তিও রয়েছে। পদ্মের চারটি দলে লেখা বং শং ষং এবং সং। দেখতে এইরকম :
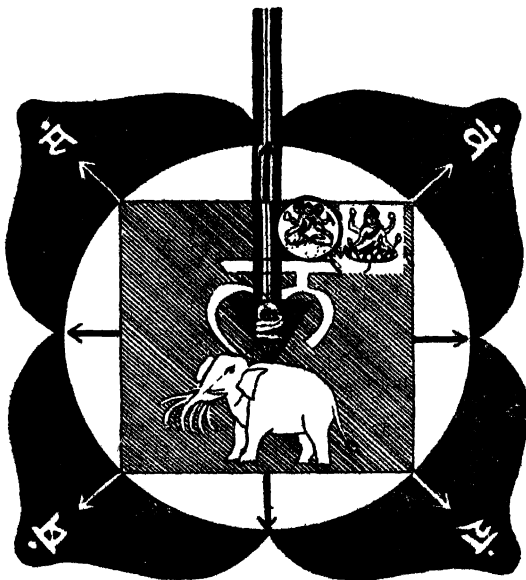
আলপনাটি দেখতে সুন্দর। সুনিপুণ গৃহিণীর হাতে আঁকা লক্ষ্মীর আলপনা বা বিয়ের পিঁড়ির আলপনা-চিত্রের মত। কিন্তু সম্পূর্ণ অভিনব। শুধু শঙ্খলতা আর পদ্ম দিয়েই শেষ নয়, রয়েছে ইঙ্গিতবহ কিছু ছবি ও দুর্বোধ্য কিছু সাংকেতিক অক্ষর। চোখে পড়লেই কেমন

চোখের দৃষ্টি আটকে ধরে। কিন্তু আমাকে সবচেয়ে যা চমকে দিল ত হল শিবলিঙ্গে জড়িয়ে থাকা সাড়ে তিন প্যাঁচের সাপটি। ঠিক এই মূর্তিই আমি দেখেছিলাম হিমালয়ের আঙিনায় তুধচটির পথের ধারে শেষবার। সেবার আমি সেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সন্ন্যাসীর আর দেখা পাইনি। জ্যোতির্লিঙ্গকে জড়িয়ে ধরে থাকা বিদ্যুৎরূপিণী এক সর্প বা সর্পিণীকে দেখে আমি এতটাই বিভ্রান্ত বোধ করেছিলাম যে, অনেকক্ষণ কিছুই ভাবতে পারিনি। আমি হ্যালুসিনেশন দেখছি কিনা তা পরীক্ষা করে নেবার জন্য চোখ কচলে আবার ফিরে তাকিয়েছিলাম। আরেকবারও ঠিক একই দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু তৃতীয়বার তাকিয়ে সে দৃশ্য আর দেখতে পাইনি। সর্কারিগোলি পাহাড়ে বাঙ্গালী বাবার আশ্রমে এই নবীন সাধুর আলপনার মধ্যে সেই সর্প বা সর্পিণী জড়িত লিঙ্গমূর্তি দেখে সেই কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। তুধচটিতে দেখা সেই মূর্তির কোন একটা গূঢ় ইঙ্গিত আছে বলে আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই ইঙ্গিত আমি ভেদ করতে পারিনি। সাপ সম্পর্কে একটা প্রবল কৌতূহল আমার মধ্যে বেঁচে থাকলেও সেই মূর্তিটির কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। অকস্মাৎ আলপনার মধ্যে এই মূর্তির ছায় দেখে আমি যেন রীতিমত চমকে গেলাম। নবীন এই সন্ন্যাসীকে আরও রহস্যময় বলে আমার মনে হতে লাগল। কিছুকাল বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে সমগ্র আলপনা সম্পর্কেই তরুণ সাধককে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি ?

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আপনার জন্য এঁকে রেখেছি।

—হঠাৎ !

—আপনি যে সাপ খুঁজছিলেন, সেইজন্যে।

বললাম, জানেন, আপনার এই আলপনার মধ্যে শিবলিঙ্গে জড়িয়ে থাকা সাপের মত একটা সাপ আমি যথার্থই নিজের চোখে দেখেছিলাম!

—কোথায় ?

—তুধচটির এক অলৌকিক আশ্রমে।

হাসতে হাসতে তরুণ সাধুটি বললেন, দেখেছিলেন ?

বললাম, আজ্ঞে। যথার্থই দেখেছিলাম।

—তারপর আর বোধহয় খোঁজ করেন নি?

—না।

—কেন?

—আমি ভেবেছিলাম, ওটা আমার চোখের ভ্রান্তি, মনের ভ্রান্তি হ্যালুসিনেশন। কিন্তু ·

—কিন্তু কি?

—যথার্থই কি এরকম কিছু আছে?

—আছে।

—আছে!

—হ্যাঁ।

—কই, আগে তো এ-সব কিছু শুনিনি?

—আগে এ-সব সম্পর্কে কোন চিন্তা করেন নি তাই।

—সত্যিই করিনি। তবে এখন চিন্তা করছি কেন বলতে পারেন?

—হ্যাঁ।

—পারেন!

—নিশ্চয়ই।

—কেন, বলুন তো?

তরুণ সাধুটি বললেন, এ যে আপনার প্রাক্তন। আপনার সমস্ত সত্তার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে সংস্কার, এই সর্পসাধনার ধারা।

বললাম, আশ্চর্য!

তরুণ সাধকটি বললেন, আশ্চর্য কেন!

—আমার নিজের মধ্যেই এমন একটা সংস্কার সুপ্ত হয়ে আছে আর আমি বিন্দুবিসর্গ তার টের পেলাম না!

—প্রাণিজগতে সেই এক পরম রহস্য। আপনার আরও অনেক জন্ম ছিল এই জন্মের আগে, আপনার মনে নেই।

বললাম, কি করে এ-সব বিশ্বাস করি বলুন তো!

হাসতে হাসতে তরুণ সাধকটি আমাকে বললেন, আপনাকে কেউ ছবি আঁকতে শিখিয়েছিল কখনও ?

বললাম, না।

—তবু আপনি ছবি আঁকতে পারেন তাই না ?

আশ্চর্য ! আমি ছবি আঁকতে পারি এই তরুণ সাধকটি ত জানলেন কি করে ? এখন দীর্ঘদিনের অনভ্যাস তেমন হাত নেই তবে একদিন যথার্থই সুন্দর ছবি আঁকতে পারতাম।

সাধকটি বললেন, আপনাকে কেউ মূর্তি তৈরি করতে শেখায়নি অথচ মূর্তি তৈরি করতে জানেন।

অবাক হয়ে সাধুটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি বি করে এ-সব জানলেন, বলুন তো ?

আমার কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে সাধকটি বললেন,

—কালীপ্রতিমা দুর্গাপ্রতিমা সবই তো তৈরি করেছেন !

বললাম, হ্যা।

—কোনদিন এ-সব করার অভ্যাস না থাকলে রাতারাতি এ-সং হয় ?

—বলতে পারব না।

—হয় না। এ সব আপনার এ-জন্মের ফল নয়, প্রাক্তনের কর্ম-প্রচেষ্টার ফল।

বললাম, অথচ সেই প্রাক্তন জীবনকে মনে করতে পারছি না।

হাসতে হাসতে সাধকটি বললেন, জানেন, অনেকে এ জীবনেরই অত্যন্ত ছোটবেলার অনেক কথা মনে করতে পারেন না। অথচ দেখুন আপনি পারেন।

বললাম, আপনি যথার্থই বলেছেন। সম্ভবতঃ আমার এক বছর বা দেড় বছরের স্মৃতিও আমার মনের মধ্যে বেঁচে আছে। আমার পায়ে খুব ছোটবেলা একটা পেরেক ফুটেছিল। আমার গুরুজনদের কাছ থেকে জেনেছি যে সে আমার এক বছর বা দেড় বছর বয়সের ঘটনা তারপর থেকে জীবনের প্রায় সব ঘটনাই আমার মনে আছে।

—বহু লোকেরই তা থাকে না জানেন।

—শুনেছি, থাকে না।

—এ থেকে আপনার কি মনে হয়?

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি বলুন।

তরুণ সাধকটি বললেন, এ থেকে কি এইটুকুই বোঝা যায় না যে, সব মানুষ সমান নয়? সবার স্মৃতিতে ধরে রাখবার ক্ষমতা সমান নয়?

বললাম, হয়তো তাই।

সাধুটি বললেন, আপনার স্মৃতি প্রখর, তাই ছোটবেলার কথা মনে আছে। আরো প্রখর হলে পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ত। স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করে রাখে মায়া। মায়ার বন্ধন যে যত কাটাতে পেরেছে তাঁর স্মৃতি তত প্রখর। এ জন্মেই যদি চর্চা করে আপনার অভ্যন্তর থেকে মায়াকে দূরে সরাতে পারেন, তাহলে দেখবেন, শুধু একটি পূর্ব-জন্ম নয়, বহু পূর্বজন্মের কথাই মনে পড়ছে।

বললাম, পূর্বজন্মে যে আমি মানুষ ছিলাম, তা কে বলবে?

—তাহলে কি ছিলেন?

—ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ হিসেবে বানরও তো থাকতে পারি!

হাসতে হাসতে সাধুটি বললেন, অসম্ভব কিছুই নেই। তবে ঠিক এক জন্ম আগেই বানর ছিলেন এরকম ভাবার কারণ নেই। সেই আদিম মানুষের যুগ থেকে মানুষ হয়েই আসছেন।

বললাম, তাহলে তো মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে আর বাড়ত না। আদিমকালের সীমিত কিছু মানুষই জন্ম জন্মান্তরে মানুষ হয়ে জন্মাত।

হাসতে হাসতে সাধুটি বললেন, বাস্তব অর্থে আপনি ঠিকই। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে মহামানসের এক বিরাট খেলা। যে মহামানস মানবমূর্তি ধরে এই পৃথিবীতে একদিন রূপ গ্রহণ করেছিল তা মূল ধারায় প্রবাহিত থাকলেও সেই মহামানসের শাখাপল্লব হিসেবে আরও নানা ধারা উপধারার সৃষ্টি হয়েছে। এক মানুষ থেকে বহু মানুষ হয়েছে। জীবরূপে, একরূপ থেকে আর একরূপে রূপান্তরিত হতে

বহু যুগ সময় লেগেছে। একই আত্মা বহু আত্মার আকারে প্রজাতি বৃদ্ধি করেছে। নবজাতক সংস্কার নিয়ে জন্মে আবার সংস্কারের বশে পুনর্জন্মের জালে পড়েছে। সংস্কারাবদ্ধ আত্মা নতুন আত্মায় বিভক্ত হয়ে নতুন সংস্কারের আবর্ত সৃষ্টি করেছে। নানা প্রাণপ্রবাহে যুগে যুগে এই খেলা চলছে বলে আদিম ইউনিসেলুলার জীব মালটিসেলুলার হয়েও তারা নিজেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। আদিম প্রাণ মুছে যায়নি। আবার নতুন প্রাণীও সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে মানুষেরও যে নতুন প্রজাতি দেখা দেবে না এমন বলা যায় না।

জিজ্ঞাসা করলাম, অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে ভবিষ্যতে মানুষ থেকে ভিন্নতর কোন জীবের জন্ম হতে পারে?

—নিশ্চয়ই।

—একটা জীবের রূপান্তর হয় কেন?

সাধুটি বললেন, মহামানসের সে-এক আশ্চর্য খেলা।

বললাম, মহামানস বললে কিছুই বুঝতে পারব না।

হাসতে হাসতে তরুণ সাধুটি বললেন, মহামানস সম্পর্কে আপনার যে কোন ধারণা নেই, তাতো নয়। আচ্ছা, থাক। মহামানস থাক, আপনাদের আধুনিক মানস দিয়েই বোঝাচ্ছি। জীবের রূপান্তর হিসেবে বিজ্ঞানে আপনাদের ব্যাখ্যা কি?

বললাম, কোনরূপে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারলেই হয় তাকে মরতে হয়, নয়তো পরিবর্তিত হয়।

সাধুটি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করেন?

বললাম, কিছুটা করি, কিছুটা করি না।

—কি রকম?

—আধুনিক বিজ্ঞান অভিব্যক্তিবাদকে সবটা মানছে না।

—যথার্থ। যতদিন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় ততদিন যদি রূপান্তরের প্রয়োজন না থাকে, তাহলে দেখুন প্রাণের একটা আদিম পর্যায়ে রয়েছে শ্যাওলা। এই শ্যাওলা থেকে বিবর্তিত হয়ে

নতুন কোন প্রজাতি আত্মপ্রকাশ করত না। কারণ শ্যাওলা আজও টিকে আছে। আবার দেখুন বড় বড় ডাইনোসর পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে। রূপান্তরিত হয়ে সম্ভবতঃ তারাই হয়েছে টিকটিকি। যদি অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করেন তাহলে মানুষের জন্মও আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগে। প্রশ্ন হতে পারে জগতে মানুষের রূপান্তর ঘটল না কেন? উত্তর এই, আজও তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে বলেই তার রূপান্তর ঘটেনি। বিপদ এলে বুদ্ধি দ্বারা সে সেই বিপদের মোকাবিলা করে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। যেদিন সেটা পারবে না, সেদিনই তার রূপান্তর ঘটবে। নতুবা একদিন পৃথিবী থেকে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সাধুটি মানুষের পর জীব জগতে আর কোন নতুন রূপান্তর না হবার কারণ হিসেবে যে কারণ দর্শালেন তা সত্যিই ভাববার মত। আমার যেন মনে হতে লাগল—জুলিয়ান হাক্সলির কোন রচনায় এ ধরনের একটা আর্গুমেন্ট এক সময় পড়েছিলাম। তাহলে সাধুটি কি আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে সুশিক্ষিত? আজকাল বহু সাধক উচ্চ-শিক্ষার অধিকারী বলে শুনেছি। আমি ক্রমশঃ তরুণ সাধকটি সম্পর্কে বেশী করে কৌতূহল বোধ করতে লাগলাম। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সাধুটি বললেন, কৈ, আর কোন কথা বলছেন না যে?

বললাম, বিজ্ঞান এখনও চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছুতে পারেনি। একদিন বিজ্ঞান-স্বীকৃত ইউনিভার্সাল সত্য আর একদিন অস্বীকৃত হচ্ছে। এ নিয়ে তর্ক থাক। বিজ্ঞান দিয়ে আমরা সত্যকে যাচাই করে নিতে চাই মাত্র। চূড়ান্ত সত্যের কাছে এসে যখন বিজ্ঞান দিশেহারা হয়, তখন আমরা হয় অতীন্দ্রিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করি, নয়তো নাস্তিক হয়ে যাই। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে নাস্তিক নই, পূর্ণমাত্রায় আস্তিকও নই। তবে অতীন্দ্রিয় জগতের একটা ইশারা আমাকে কেমন যেন মাঝে মাঝেই বিহ্বল করে দেয়। পদার্থ বিজ্ঞান ফেলে তখন পরাবিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়ি। সুতরাং জন্মান্তরের উপর তর্ক থাক। রূপান্তরের কারণ নিয়েও বেশীদূর এগিয়ে লাভ নেই। কারণ, বানর

যদি মানুষ হবে, তবে বানরের অস্তিত্ব আজও থাকবে কেন। সাধারণ বুদ্ধি দিয়েও আত্মার পুনর্জন্ম বিশ্বাস করলে নতুন মানুষের জন্ম দেখে বিভ্রান্তি আসে। যদি বানরের আত্মা নতুন মানব আত্মা রূপে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাহলে বানরের সংখ্যা বাড়ছে কেন? নিশ্চয়ই তার ও পূর্বপুরুষ হিসেবে অন্য কোন প্রাণীর আত্মা বানরের আত্মা লাভ করছে? এইভাবে আদিম কোন একটা প্রাণ আজ পর্যন্ত বয়ে চলেছে। তার জন্ম তাহলে কোন্ রহস্যজনক উৎস থেকে? এ-তর্কের শেষ নেই। 'ভূশণ্ডির মাঠে' গল্পে পরশুরাম জন্মান্তর নিয়ে যে ব্যঙ্গাত্মক গল্প লিখেছেন তাও ভেবে দেখার মত। আসলে সাধারণ বুদ্ধিতে, সাধারণ তর্কে এর কোন ব্যাখ্যা নেই। সেইজন্যই অতীন্দ্রিয় বলে একটা কথা আছে, আপনি যাকে মহামানস বললেন। সেই মহামানসের সন্ধান না পাওয়া গেলে সত্যের উৎসে কোনদিনই যাওয়া যাবে না বুঝেছি। সেই সত্যের উৎসে যাওয়ার পথ কোন্টা? নানা মুনির নানা মত আছে। আমার মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাপ। আপনার কাছে সেই সর্প-রহস্যই জানতে এসেছি। যথার্থই কি সাপ সেই সত্যের উৎসে নিয়ে যেতে পারে?

হাসতে হাসতে তরুণ সন্ন্যাসীটি বললেন, সত্যের কোন উৎস নেই। সত্য একমেবাদ্বিতীয়ম। তবে সাপ বলে একটা কথা আছে। সেই সাপকে চিনতে পারলে সাপ যথার্থই সেখানে নিয়ে যেতে পারে।

—সে সাপ কি?

সাধুটি নিজের আলপনার মধ্যে শিবলিঙ্গ জড়িয়ে থাকা সেইটি সাড়ে তিন প্যাঁচের সাপটিকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই সেই সাপ।

বললাম, বাস্তব সাপের আমার কাছে অর্থ আছে, কিন্তু এ সাপ অর্থহীন। এ সাপ কি, আমায় একটু বুঝিয়ে বলবেন?

হাসতে হাসতে তরুণ সাধুটি বললেন, নিশ্চয়ই। সেইজন্যই তো আপনার উদ্দেশ্যে এই আলপনা এঁকে বসে আছি।

বললাম, ঠিক আছে। এই আলপনার অর্থ আমাকে এবার বুঝিয়ে বলুন।

তরুণ সাধুটি বললেন, এ আলপনা রয়েছে আপনার নিজের শরীরের মধ্যেই।

—আমার!

—হ্যাঁ।

—অথচ আমি···

—জানতে পারছেন না, এই তো?

—হ্যাঁ।

—কেন পারছেন না, জানেন?

—কেন?

—এ আলপনাকে জানতে হলে দেহের নাড়িনক্ষত্রের সঠিক ঠিকানা জানা দরকার আগে।

—নাড়িনক্ষত্র?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বললাম, আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে, দয়া করে আমাকে আপনি বলুন।

সাধুটি বললেন, হ্যাঁ, বলব। আপনাকে বলতেই হবে।

—কেন?

—আপনি জানতে চাচ্ছেন, সে-কারণে তো বটেই। তাছাড়া আরও কারণ আছে।

—কি সেটা?

—সেটা আমি বলব না। আপনিই একসময় বুঝবেন।

এবার আমাকে বলতে দিন। সাধুটি বলতে আরম্ভ করলেন:

জানেন, মানবদেহে নাড়ি রয়েছে শত সহস্র, লক্ষ লক্ষ বললেও ক্ষতি নেই। অশ্বত্থ পাতার সবুজের আড়ালে যেমন রয়েছে অসংখ্য সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মত সুতো, তেমনি মানুষের দেহের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নাড়ি। 'নড়' এই মূল শব্দ থেকেই এসেছে নাড়ি শব্দ। 'নড়' শব্দের অর্থ হল গতি। নাড়ির মধ্য দিয়েই দেহের সর্বত্র জীবনী-শক্তির প্রবাহ চলেছে। তন্ত্র এই জীবনী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা

অভিনব পন্থা। এইজন্য তন্ত্র যারা করেন, নাড়ির খবর তাঁদের রাখতে হয় সবার আগে।

বললাম, আমি যে সাপের খোঁজ করে বেড়াচ্ছি, তার সঙ্গে কি তন্ত্রের যোগাযোগ আছে?

—নিশ্চয়ই। তন্ত্রই তো সেই সাপের সন্ধান দিয়েছে।

বললাম, জানেন, আমি লছমনঝুলার উত্তরে হিমালয়ের আঙিনায় অদ্ভুত এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধকের দেখা পেয়েছিলাম!

তরুণ সাধকটি বললেন, আগেই তো বলেছি জানি!

—জানেন!

—হ্যাঁ।

—তিনি কে আমাকে বলতে পারেন?

—তিনি এক উচ্চকোটির সাধক। তন্ত্রপথেই সাধনা করেছেন। তবে তিনি হলেন অনেক উপরের সাধক। তাঁর ভাব হল দৈবীভাব, পশ্বাচার বা বীরাচার তন্ত্রের অনেক উর্ধ্বে তিনি।

বললাম, তিনি আমাকে এই সাপের সন্ধান দিতে গিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির কথা বলেছিলেন।

—তিনি আপনাকে সাপের গোড়ার কথা বলেছিলেন।

—কি রকম?

—যে ইচ্ছাশক্তি বাসনার তরঙ্গে বস্তুরূপ ধারণ করেছেন, সেই বস্তুর মধ্যেই তিনি এসে আবার ঘুমিয়ে আছেন সর্পাকারে। তাঁকে জাগরিত করলে যেখান থেকে এই বস্তুজগতের আকারে তাঁর গতির শেষ পর্যায় সেখান থেকে আবার তিনি উৎসের দিকে ফিরে যাবার চেষ্টা করেন।

মনে পড়ে গেল দুধচটির পথের ধারে সেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন তান্ত্রিকের কথা। একটা প্রকাণ্ড ইচ্ছাশক্তি অব্যক্ত কারণে কেন্দ্র থেকে ছুটে এসে ইচ্ছাতরঙ্গের শেষ পর্যায়ে রূপ নিয়েছে বস্তুজগতের। এই বস্তুজগতের মধ্যে এসে সেই ইচ্ছাশক্তি হয়েছে নিষ্ক্রিয়। সমস্ত বস্তুর মধ্যেই সর্পাকারে সেই শক্তি নিষ্ক্রিয় রয়েছে। তন্ত্রগতভাবে এ

সম্পর্কে একটা ধারণা হলেও অভিজ্ঞতার মধ্যে এর স্বরূপ সহজে বোঝা যায় না। এ-জন্য দেহের অভ্যন্তরে তাকাতে হয়, দেহতত্ত্ব জানতে হয়। তুধচটির সেই সন্ন্যাসী আমাকে দেহতত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই বলেননি। সম্ভবতঃ দেহতত্ত্ব সম্পর্কে তখনও আমার জানার সময় হয়নি বলেই তিনি এ বিষয়ে নীরব ছিলেন। সময় না হলে কিছুই হয় না। চারা গাছে ফুল ফোটে না। গাছ যখন উপযুক্ত হয় তখনই তার প্রাণশক্তি ফুলের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। জানি না সেই দেহতত্ত্ব জানার সময় এবার আমার হয়েছে কি না। শুনেছি, সময় হলেই গুরু দেখা দেন। এ-পৃথিবীতে যার কাছে শিক্ষাগ্রহণ করা যায় তিনিই গুরু। কখন কোন্ মুহূর্তে যে কি শিক্ষা হবে কে বলতে পারে। কখনও একটা ফুল দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়, কখনও একটা ফুলের বুকে প্রজাপতি বসার অর্থ খুঁজে পেলে জীবন-রহস্যের ঊর্ধ্বে এক কৌতুকময় শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে নিষ্প্রাণ অনেক জড়বস্তুও গুরুর কাজ করে, পশুপাখি তো করেই। সময় হলেই পারিপার্শ্বিকের মধ্য থেকে নানা সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। হয়তো এখনই আমার দেহতত্ত্ব সম্পর্কে জানার সময় হয়েছে। সুতরাং আর কোন অযথা বাক্য ব্যয় না করে তরুণ সাধকটিকে বললাম, দয়া করে এবার আপনি নাড়ি সম্পর্কে বলুন।

তরুণ সাধকটি আবার বলতে লাগলেন, দেহের মধ্যে নাড়ি অসংখ্য, বিজ্ঞান একে গুণতে পারেনি। কিন্তু তন্ত্র সাধকেরা অনেকে এর সন্ধান জানেন। তবে সাধকের জানার উপর নাড়ির সংখ্যার হেরফের হয়। সেইজন্য নানা তন্ত্রে নাড়ির সংখ্যা সম্পর্কে নানা অভিমত। যেমন ভূতশুদ্ধি তন্ত্রের মতে মানুষের দেহে আছে ৭২,০০০ হাজার নাড়ি। প্রপঞ্চসার তন্ত্রের মতে ৩০০০০০। আবার শিব সংহিতার মতে ৩৫০০০০। তবে নাড়ির সংখ্যা যা-ই হোক না কেন, সব নাড়িরই তেমন গুরুত্ব নেই। নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু নাড়িই হল তন্ত্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ-সব নাড়ির মধ্যে সবগুলিই যে স্থূল নাড়ি তা ভাববেন না। যন্ত্রপাতি দিয়ে বিশ্লেষণ করে যে তাদের খুঁজে বের করবেন, তা হবে না।

হেসে বললাম, তাহলে তারা যে আছে, তা জানব কি করে ?

তরুণ সাধকটি হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা আপনি আপনার ঠাকুর্দাকে দেখেছেন ?

বললাম, না। আমার জন্মের আগেই তিনি মারা গেছেন।

—আপনি তো তাঁকে দেখেন নি, তাহলে কি করে জানেন যে, তিনি ছিলেন ?

—জানি, শুনে। তাছাড়া আমার যেমন বাবা ছিলেন, তেমনি আমার বাবারও নিশ্চয়ই একজন বাবা ছিলেন। বাবা ছাড়া তো আর সন্তান সম্ভব নয় !

—তাহলে না দেখেও বিশ্বাস করা যায়, কি বলেন ?

—এ-সব ক্ষেত্রে তা যায় বইকি।

তরুণ সাধকটি বললেন, আপনি নিজের বাবা, তাঁর বাবা, তাঁর বাবা এমন করে প্রথম মানুষের উৎপত্তি পর্যন্ত যেতে পারেন ? নিশ্চয়ই প্রথম দিকে পৃথিবীতে এত মানুষ ছিল না ? এবং আদিতে নিশ্চয়ই একজন বা দু'জনই ছিলেন ?

বললাম, সে-ভাবে হিসেব করতে গেলে তাই বলতে হয়। সমস্ত ধর্মেই সেইজন্য আদি মানব ও আদি মানবীর কল্পনা করা হয়েছে, যেমন, খ্রীষ্টানদের আদম ও ইভ।

—এরাও নিশ্চয়ই কোথাও থেকে এসেছিলেন ?

—নিশ্চয়ই।

—কোথা থেকে ?

—তা কে বলবে ? শাস্ত্র মতে ঈশ্বর থেকে।

—কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব তো অনেকে বিশ্বাস করে না ?

—তা করে না। তারা অবশ্য জীব-জগতের উৎপত্তির মূলে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদকে ধরতে চান।

—অভিব্যক্তির গোড়াতেও তো একটা কিছু ছিল ?

—হ্যাঁ, ধরুন ইউনিসেলুলার প্রাণ।

—তার আগে ?

—বৈজ্ঞানিকরা বোধহয় ধারণার মধ্যে আনতে পারেননি। জীবনের একটা ক্ষুদ্র একক হল জিন। তাকেও ভাগ করা হয়েছে শুনেছি, তার ওপরে আর যাওয়া যায়নি!

তরুণ সাধকটি বললেন, আপনি যেমন আপনার বাবার ওপরে হাতেনাতে বিচার করে যেতে পারেন না, বাবার কথায় বিশ্বাস করেন, তেমনই জিনের আজ পর্যন্ত পাওয়া সূক্ষ্মতম অস্তিত্বের উর্ধ্বেও যখন কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে, তাকেও বিশ্বাস করেন না কেন? না দেখেও যদি ঠাকুর্দার অস্তিত্ব মানেন, আপনার বাবার কথামত, তাহলে না দেখেও উৎপত্তির মূলে যে শক্তি, তাঁকেও মেনে নিন না কেন? সাধু সন্ন্যাসীরা তো তার কথা বলেছেন?

—সেই শক্তি এল কোত্থেকে কেউ যদি প্রশ্ন করেন?

—তার জবাবও সাধুরা দিয়েছেন?

—কি দিয়েছেন?

—অবাঙ্‌মানস গোচরম।

—এটা তো ব্যর্থতার কথা, বলতে না পারার কথা।

—না।

—কেন, না?

—সাধুসন্তেরা বলেছেন এবার বাক্যে হবে না, অনুভব দিয়ে তাকে বুঝতে হবে। সব কিছুর উর্ধ্বে সর্বব্যাপ্ত যে শক্তির খেলা চলছে, তাকে বুঝবার জন্য সেই শক্তি হতে হবে। শক্তি হলে শুধু নিজের স্বরূপ বুঝবেন, বলতে পারবেন না। মিষ্টি খেলে স্বাদ বোঝা যায়, বর্ণনা করে মিষ্টির মিষ্টত্ব বলা যায় না।

বললাম, মুখ আছে, খেলে মিষ্টির স্বাদ বোঝা যায়। কিন্তু কি কি দিয়ে সেই সর্বপ্রথমের অনুভব হবে?

—কেন? আপনার দেহ দিয়ে?

—সসীম দিয়ে অসীম!

তরুণ সাধকটি হাসলেন। হেসে বললেন, শীতের আকাশটা দেখেছেন তো?

—হ্যাঁ।

—কি রকম ?

—নীল !

—তার কোথাও শেষ আছে বলে মনে হয় ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ?

—দিগন্তে।

—ওটা কি যথার্থ ই তার শেষ ?

—না।

—জানবেন এই দেহটা সীমিত দেখায় বটে, আসলে সীমিত নয়। আপনি আকাশের স্বরূপ জানেন, তাই বললেন, দিগন্তটা শেষ নয়। যে মূর্খ জানে না, সে বলবে শেষ। যে দেহের স্বরূপ বোঝে না, সেই দেহকে দেখে ছোট করে। দেহের স্বরূপ বুঝলে বলে—'দেহের ভিতর অবাককাণ্ড, দেহে নাচে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।'

কথাটা শুনে আমার খুব আশ্চর্য লাগল। ঠিক এই কথাটাই শুনেছিলাম আমি আমার গ্রামের সেই বাউল গায়ক ভজনদাসের মুখে। যার কথা আমি 'সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে'-এর প্রথম খণ্ডে বলেছি। একটা অদ্ভুত দেহতাত্ত্বিক সত্য সেই প্রাচীনকাল থেকেই বয়ে আসছে। আমরা তার সন্ধান জানি না এবং জানতে চাই না, তাই। আমি অবাক হয়ে তরুণ সাধকটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন, কিছু বলবেন ?

বললাম, বুঝতে পারছি যে দেহ সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। দেহের সীমার মধ্যে যে অসীম আছে তাকে জানি না। কিন্তু তা জানা যাবে কি করে বলুন।

হাসতে হাসতে তরুণ সাধকটি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, —দেহ দিয়েই দেহের মধ্যে যে অসীম থাকে তাকে জানা যাবে।

বললাম, সীমিত দেহ দিয়ে অসীমকে ধরা কি সম্ভব ?

সাধকটি বললেন, সীমিত মন নিয়ে যদি অসীমকে অনুমান করতে

পারেন, তাহলে সীমিত দেহ দিয়েই বা তাকে ধরা যাবে না কেন। সীমিত মন যখন অসীমের সন্ধান পায়, তখন সে যেমন বাক্ হারিয়ে ফেলে, তেমনি সীমিত দেহ যখন অসীমের সন্ধান পায়, তখন সে নিথর হয়ে যায়। শুনেননি, সাধুসন্তের সমাধি হলে কি হয়?

বললাম, শুনেছি।

—বিজ্ঞানে এমন অনেক বিষয় আছে যাকে মুখে বলা যায় না জানেন, অঙ্কে ধরতে হয়?

—হ্যাঁ।

—যোগসাধনা হল সেইরকম অঙ্ক। অঙ্কের জন্য যেমন সংখ্যাবাচক চিহ্ন জানতে হয়, ইংরেজীতে যাকে বলে নিউমেরালস, তেমনি দেহাতীতের জন্য দেহের নাড়িজ্ঞান প্রয়োজন। নিউমেরালস যেমন অব্যক্তকে জানিয়ে দেয়, নাড়িও তেমনই দেহের মধ্যে দেহাতীতের সন্ধান দেয়।

বললাম, আপনার যুক্তিগুলো অদ্ভুত, আমি খণ্ডন করতে পারি না। অবশ্য খণ্ডন করবার মানসিকতা নিয়েও আসিনি। আপনি সেই দেহের নিউমেরালস অর্থাৎ নাড়ির কথা যা বলছিলেন বলুন, শুনি।

তরুণ সাধকটি একটু হাসলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন। বললেন, নাড়ির মধ্যে অধিকাংশই হল সূক্ষ্ম নাড়ি। সাধারণ চোখে দেখা যায় না। বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতিতেও ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে শুধু মানসনেত্রে। সেইজন্য একে বলে যোগ-নাড়ি। প্রাণশক্তি এই যোগনাড়ির মধ্য দিয়েই প্রবাহিত। দেহের মধ্যে দেহাতীতকে জানতে হলে এই নাড়িশুদ্ধি আগে প্রয়োজন। মনের পবিত্রতা পেতে হলে দেহের পবিত্রা আগে দরকার। অসুস্থ দেহেই মন অসুস্থ হয়। আমি সামান্য একটু বাধা দিলাম। একটা কথা বলব?

—নিশ্চয়ই।

—শুনেছি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ক্যানসার হয়েছিল। তাঁর দেহ অসুস্থ হয়েছিল। তাহলে তাঁর মনও কি সুস্থ ছিল না সে সময়?

তরুণ সাধকটি হাসলেন। বললেন, ধরুন আপনি একটা পাহাড়ের চূড়োয় স্থায়ী ঘর বাঁধবেন। ঘর বাঁধলেন, তারপর ধসে পাহাড়ী পথটা নষ্ট হয়ে গেল। তাতে আপনার ঘরটিও নষ্ট হয়ে যাবে কি ?

বললাম, না।

সাধকটি বললেন, দেহের পথ বেয়ে যে-মন দেহের চূড়ায় উঠে অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহে চলে যায়, সেই অক্ষত দেহে দেহের ক্ষত লাগে না। তবে দেহের যোগনাড়ি বেয়ে সেখানে আগে ওঠা চাই। না উঠলে পাহাড়ের গায়ে ধস নামলে মাঝপথের পথিকও সেই ধসে নেমে যাবেন।

বললাম, সত্যি, আপনার উপমাগুলি বেশ। এবার বলুন।

সাধকটি আবার বলতে লাগলেন, দেহ অশুদ্ধ থাকলে দেহের মধ্যে কুণ্ডলীতে আবদ্ধ শক্তি যাকে বলে কুণ্ডলিনী, তা আর উর্ধ্বে উঠতে পারে না। ফলে যেখান থেকে সেই শক্তির উৎপত্তি সেখানে সে ফিরে যেতে পারে না। নাড়িজ্ঞান করে যোগ-নাড়ি চর্চা করলে কুণ্ডলিনী শক্তির উর্ধ্বে ওঠার পথ সহজ হয়। একেই বলে প্রাণায়াম অর্থাৎ দেহ শুদ্ধিকরণ।

প্রাণায়াম শব্দের অর্থ এতক্ষণে আমার কাছে পরিষ্কার হল। আমি আরও শোনার জন্য সাধকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তিনি বললেন, নাড়ির মধ্যে চোদ্দটি নাড়িই হল বিখ্যাত আবার এই চোদ্দটি নাড়ির মধ্যে আবার ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়িই হল প্রধান। এই তিনের মধ্যে আবার প্রধান হল সুষুম্না। এর মধ্য দিয়েই প্রাণশক্তি যোগবলে উঠে চলে উর্ধ্বমুখে। এই প্রাণশক্তি একের পর এক চক্রভেদ করে ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে চলে যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, চক্র কি ?

তরুণ সাধকটি বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, সব বলছি। আগে নাড়ির কথাটাই বলে নি। সুষুম্না নাড়ি হল মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। এর ভিত্তি হল মূলাধার চক্র। তিনি লিঙ্গমূল ও গুহ্যদেশের মাঝখানে

একটা জায়গা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এই মূলাধার চক্র থেকে আরম্ভ করে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে সুষুম্নার ঊর্ধ্বগতি। সুষুম্না হল বহ্নিস্বরূপ, অর্থাৎ এর বর্ণ হল আগুনের মত লাল। এজন্য একে বলা হয় তামসিক সুষুম্না। এর মধ্যে আছে রাজসিক বজ্রা বা বজ্রিনী নাড়ি। ঐ বজ্রিনী নাড়ির মধ্যেও আছে ধূসর বর্ণের সাত্ত্বিক নাড়ি যাকে বলে চিত্রা বা চিত্রিণী। এই চিত্রা বা চিত্রিণীর মধ্যেই থাকে ব্রহ্মনাড়ি। সুষুম্না হল বহ্নিস্বরূপা, বজ্রিনী নাড়ি হল সূর্য স্বরূপা। চিত্রা বা চিত্রিণী নাড়ি হল চন্দ্রস্বরূপা। শব্দব্রহ্মণের এই হল তিন অবস্থা।

'শব্দব্রহ্মণ' এই শব্দটুকু কানে যেতেই আমার মনে পড়ে গেল লছমনঝুলার উত্তরে সেই দুধচটির পথের ধারে দেখা সন্ন্যাসীর কথা। তিনি আমাকে শব্দব্রহ্মণের চরিত্র বিশ্লেষণ করে দিয়েছিলেন। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আমি তার উল্লেখ করেছি। সর্কারিগোলির বাঙালী বাবার মঠের বারান্দায় বসে এই শব্দের নতুন দিকের সন্ধান পেলাম। সেইজন্য আরও আগ্রহে তাঁর দিকে তাকালাম আমি। তিনি বলতে লাগলেন,—চিত্রা বা চিত্রিণী নাড়ির শেষ প্রান্তের মুখকে বলে ব্রহ্মদ্বার, কারণ এই মুখ দিয়েই মূলাধারে স্থির হয়ে থাকা কুণ্ডলিনী শক্তি, তন্ত্রে থাকে বলে দেবী কুণ্ডলিনী তিনি সহস্রার বা ব্রহ্মরন্ধ্র যাকে তন্ত্রে সহস্রদল পদ্মও বলা হয়—সেই দিকে এগিয়ে যান। এজন্য নাড়িকে বলা হয় কুলমার্গ বা প্রধান পথ।

সুষুম্না নাড়ির বাইরে আছে আরো দুটি নাড়ি ঃ—শুক্লবর্ণের নাড়ি ঈড়া, যাকে বলা হয় শশী বা চন্দ্র, এবং রক্তবর্ণের পিঙ্গলা নাড়ি যাকে বলা হয় মিহির বা সূর্য। দেখতে অনেকটা ডালিম ফুলের কেশরের মত। এ নাড়ি দুটো নাকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িত থাকে। তন্ত্রমতে ঈড়া হল স্ত্রী-নাড়ি অর্থাৎ শক্তিস্বরূপা। এ নাড়ি হল অমৃতের প্রতীক, অমৃত বিগ্রহা। এর অবস্থান মেরুদণ্ডের বামে। পিঙ্গলা হল পুরুষ-নাড়ি যার চরিত্র হল রুদ্রের মত। যাকে বলে রৌদ্রাত্মিকা। এর অবস্থান মেরুদণ্ডের ডান দিকে। এ-দু'নাড়িই হল

কাল বা সময়ের প্রতীক। এবং সুষুম্না হল সেই নাড়ি যা কালকে গ্রাস করে। কারণ এ-পথেই সীমিত সময় অনন্ত সময়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। এ তিনটি নাড়িকে কেউ কেউ বলেন গঙ্গা (ঈড়া) যমুনা (পিঙ্গলা) এবং সরস্বতী (সুষুম্না)। এই তিনটি নাড়িই মূলাধারে মিশে আছে। এইজন্য এদের কেউ কেউ বলেন যুক্ত ত্রিবেণী।

এইটুকু বলেই সেই তরুণ সাধকটি একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন :

'মেরোর্বাহ্যপ্রদেশে শশি-মিহিরশিরে সব-দক্ষে নিষণ্ণে
মধ্যে নাড়ি সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্যাগ্নিরূপা'
ধুস্তুর-স্মেরপুষ্পগ্রথিততমবপুঃ কন্দমধ্যাচ্ছিরঃস্থা
বজ্রাখ্যা মেঢ্রদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমেহস্যা জ্বলন্তী।'

আমি বললাম, এ শ্লোকের অর্থ কি আমায় একটু বুঝিয়ে বলবেন? সংস্কৃতে আমার জ্ঞান অত্যন্ত কম।

তরুণ সাধকটি বললেন, আমি এতক্ষণ যা বললাম প্রায় সেই একই কথা অর্থাৎ দেহের মেরুদণ্ড নামে যে বড় একটা অস্থি আছে, তার বাইরে বাঁদিকে ঈড়া নাড়ি ও ডাইনে পিঙ্গলা নাড়ি। ঈড়ানাড়ী শুক্লবর্ণা ও চন্দ্রস্বরূপা। পিঙ্গলা নাড়ি ডালিম ফুলের কেশরের মত রক্তবর্ণা ও সূর্যস্বরূপা। ঈড়া শক্তি ও পিঙ্গলা পুরুষ। মেরুদণ্ডের মধ্যবর্তী রন্ধ্রে আছে সুষুম্না নাড়ি। এ হল ত্রিতয়গুণময়ী। ত্রিতয়গুণময়ী এই কারণে যে, সুষুম্না, বজ্রা ও চিত্রিণী এই তিন নাড়ি কলাগাছের পেটোর মত পরস্পর জড়িয়ে থাকে বলে একে ত্রিবলিতরজ্জু অর্থাৎ তিন বলয়ে পেঁচিয়ে থাকা দড়ির মত একটা দড়ি বলে মনে হয়। এরা সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণাত্মিকা বলে ত্রিতয়গুণময়ী। এর মধ্যে চিত্রিণী সত্ত্বগুণের, বজ্রা রজঃ গুণের এবং সুষুম্না তমগুণের অধিকারিণী। এই তিন নাড়ি আবার চন্দ্র-সূর্য-অগ্নিরূপা। চিত্রিণী চন্দ্ররূপা—সুতরাং শুক্লবর্ণা, বজ্রা সূর্যরূপা সেইজন্য ডালিম ফুলের কেশরের মত এবং সুষুম্না অগ্নিরূপা সুতরাং রক্তবর্ণা। সুষুম্না নাড়ির সংস্থান হল বিকশিত ধুতুরা ফুলের মত। কন্দস্থান অর্থাৎ গুহ্যদ্বার থেকে দু-আঙুল উপরে ও লিঙ্গমূল থেকে

দু-আঙুল নীচে মূলাধার থেকে উঠে এই নাড়ি গেছে মাথাতে। সেখানে যে ব্রহ্মতালুতে সহস্রদল পদ্ম রয়েছে নিচের দিকে মুখ করে, গেছে সেই দিকই অর্থাৎ পদ্মের অন্তর্গত বারটি দলবিশিষ্ট পদ্মের নিচু পর্যন্ত। সুষুম্না নাড়ির দুই মূল ও মাথা ধূস্তুর ফুলের অর্থাৎ ধুতুরা ফুলের মত। এই নাড়ি মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে গলা পর্যন্ত গেছে। সেখান থেকে শঙ্খিনী নাড়ির সঙ্গে মিশে একত্রে বাঁ কানে গিয়ে মিশেছে। সেখান থেকে গেছে কপালে। কপাল থেকে গেছে সহস্রদল পদ্মে। বজ্রা নাড়ি লিঙ্গমূলের সমদেশ থেকে বেরিয়ে সুষুম্না নাড়ির মধ্য দিয়ে গেছে মাথা পর্যন্ত: এ নাড়ি হল জাজ্বল্যমানা।

এইটুকু বলে তরুণ সাধকটি আর একটি শ্লোক বললেন:

"তন্মধ্যে চিত্রিণী সা প্রণব-বিলসিতা যোগিনাং যোগগম্যা
লূতাতন্তুপমেয়া সকলসরসিজান্ মেরুমধ্যান্তবস্থান্।
ভিত্ত্বা দেদীপ্যতে তদ্‌গ্রথনরচনয়া শুদ্ধবোধস্বরূপা
তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী হরমুখকুহরাদাদিদেবান্তরস্থা॥"

এই শ্লোকটি বলে আমি আবার এর ব্যাখ্যা জানতে চাইবার আগেই তরুণ সাধকটি নিজেই তার অর্থ বলে যেতে লাগলেন। বললেন, বজ্রা নামক নাড়ির মধ্যে আছে চিত্রিণী নাড়ি। এটা মাকড়সার সুতোর মত খুব সূক্ষ্ম। একমাত্র যোগীরাই যোগদ্বারা এর অস্তিত্ব জানতে পারেন। বাহ্যদৃষ্টিতে একে দেখা যায় না। আজ্ঞাচক্র—দুই ভুরুর মধ্যবর্তী স্থান দেখিয়ে তিনি বললেন, আজ্ঞাচক্রের মধ্যে অবস্থিত প্রণবজ্যোতির দ্বারা এই নাড়ি সমুদ্ভাসিত। মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সুষুম্না ও বজ্রা নাড়ির মধ্যবর্তী চক্রগুলোকে ভেদ করে, এবং মালার সুতোর মত চক্রগুলিকে গেঁথে দীপ্তিময়ী হয়েছে। এর উপলব্ধি হলে বিশুদ্ধ জ্ঞান হয়। চিত্রিণী নাড়ি মেরুদণ্ডের ভেতরকার চক্রগুলি ভেদ করেই যে থেমে আছে তা নয়, দুই ভুরুর মধ্যে আজ্ঞাচক্রকেও ভেদ করে গেছে। চিত্রিণীর মধ্যেও একটা ছিদ্রপথ আছে, যাকে বলে ব্রহ্মনাড়ি। এই নাড়ি দিয়ে শব্দব্রহ্মস্বরূপ কুলকুণ্ডলিনী সহস্রারে পরম শিবের কাছে যাতায়াত করে। এই জন্যই একে ব্রহ্মনাড়ি বলা হয়। ব্রহ্মনাড়ি

কিন্তু শিরা নয়, চিত্রিণী নাড়ির রন্ধ্রপথ মাত্র। এই নাড়ি কন্দমূল অর্থাৎ মূলাধারের স্বয়ম্ভু লিঙ্গের ছিদ্র থেকে বের হয়ে ব্রহ্মতালুতে সহস্রদল কমলের কর্ণিকার অন্তর্গত পরম শিব পর্যন্ত গিয়েছে।

শেষ কথাগুলো যে আমার কাছে খুব পরিষ্কার হল তা নয়। তবে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বলতে তুধচটিতে আমার যে সর্পিণী পরিবেষ্টিত জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন হয়েছিল তার কথা মনে পড়ল। সেই জ্যোতির্লিঙ্গের মুখ সাড়ে তিন প্যাঁচে একটি সর্পিণী ঘিরে ধরে নিজের মাথা দিয়ে বন্ধ করে ছিল। সবই একটা রহস্যময় ব্যাপার। নিশ্চয়ই এরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পরে পাব, এই চিন্তা করে আমি আর সেই তরুণ সাধকটিকে বাধা দিলাম না। আরো শোনার জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তরুণ সাধকটি আর একটি শ্লোক বললেন :

'বিদ্যুন্মালাবিলাসা মুনিমনসিলসত্তন্তুরূপা সুসূক্ষ্মা
শুদ্ধজ্ঞানপ্রবোধা সকল-সুখময়ী শুদ্ধবোধস্বভাবা।
ব্রহ্মদ্বারং তদাস্যে প্রবিলসতি সুধাধারগম্যপ্রদেশং
গ্রন্থিস্থানং তদেতদ্বদনমিতি সুষুম্নাখ্যনাড্যা লপন্তি॥"

শ্লোকটি বলে তার ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। বললেন, এর অর্থ ব্রহ্মনাড়ির শোভা তরিদাবলীর মত অতি উজ্জ্বল। যোগীরা তাঁদের অন্তরে অনুভবের মধ্যে একে সূক্ষ্মতম সমুজ্জ্বল সুতোর মত দেখেন। এই নাড়ির জ্ঞান হলে বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মায়। এ নাড়ি হল সমস্ত সুখের সমষ্টিস্বরূপ। এই নাড়ির মুখেই রয়েছে ব্রহ্মদ্বার। মূলাধারের কুণ্ডলিনী এ পথেই সহস্রারে শিবের কাছে যাতায়াত করেন। শিব-শক্তির মিলনে এ অঞ্চল অমৃতরসধারাসিক্ত হয়। আগমপণ্ডিতেরা এ অঞ্চলকে সুষুম্না নাড়ির গ্রন্থিস্থান অর্থাৎ কন্দস্থান ও সুষুম্নার সংযোগস্থল বা সুষুম্নার মুখ বলেও বর্ণনা করেছেন।

তরুণ সাধকটিকে দেখলাম চিত্রাঙ্কনেও যথেষ্ট তৎপর। শ্লোক তিনটি ব্যাখ্যা করার পরই খুব তাড়াতাড়ি খড়িমাটি দিয়ে যোগাসনে উপবিষ্ট এক সাধকের চিত্র এঁকে ফেললেন, এবং অতি দ্রুত সেই দেহের মধ্যেও মেরুদণ্ড ও বিভিন্ন নাড়ির রেখা টেনে দিলেন।

লিঙ্গমূলের নিচ থেকে এই নাড়িগুলো কোথায় কি ভাবে গেছে সঙ্গে সঙ্গে এঁকে ফেললেন। লিঙ্গমূল থেকে সহস্রার বা ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত মেরুদণ্ডের উর্ধ্বরেখা বরাবর কয়েকটি চক্রও আঁকলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মূলাধার চিত্রে খড়িমাটি ছুঁইয়ে আমাকে বললেন. এই হল মূলাধার, বুঝলেন? এ সম্পর্কে আপনাকে পরে বলব. এখন শুধু শুনে নিন। এই মূলাধার চক্র থেকে যাত্রা করে নাড়িগুলি উপরে উঠে গেছে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। যেভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে, তিনি সেই প্যাঁচগুলো আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। দেখলাম নাড়িগুলি কখনও গেছে ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। মেরুদণ্ডের স্তরে স্তরে যে রয়েছে দণ্ড বা গাঁট, তাকে ঘিরেই উঠেছে এই নাড়িগুলি। ঐ ভঙ্গীতেই কপালের দুই ভুরুর মধ্যবর্তী অংশ পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। তারপর আবার মিলে গেছে সুষুম্নার মধ্যে। তারপর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধারায় এগিয়ে গেছে। দুই ভুরুর মধ্যে যে স্থান থেকে এই নাড়িগুলি আবার তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে সেই স্থানে খড়িমাটি ঠেকিয়ে সাধকটি বললেন—একে বলা হয় আজ্ঞাচক্র। অনেকে বলেন মুক্ত ত্রিবেণী।

তরুণ সাধকটি একটি নাড়ি দেখালেন—দক্ষিণ অণ্ডকোষ থেকে প্রবাহিত হয়েছে। তা শেষপর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে বাম নাসারন্ধ্রে। আর একটি দেখালেন বাম অণ্ডকোষ থেকে প্রবাহিত হয়ে গেছে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র পর্যন্ত। বললেন, এই দুই নাড়ি **Positive Negative**-এর মত কাজ করে। জগতের সমস্ত ক্রিয়াশক্তির মূলেই এই **Positive Negative** শক্তি কাজ করে। পিঙ্গলা হল **Positive** শক্তির প্রবাহ পথ। অর্থাৎ সৌরশক্তির প্রবাহ পথ। আর ঈড়া হল **Negative** শক্তির অর্থাৎ চান্দ্র-স্রোতের প্রবাহ পথ। সুষুম্না দেখিয়ে বললেন, এর মধ্যেও এই ধরনের সৌর ও চান্দ্রশক্তি অর্থাৎ **Positive Negative** শক্তির প্রবাহপথ আছে। কিন্তু এসব নাড়ি এত সূক্ষ্ম যে, চর্মচক্ষুতে যে দেখবেন তার উপায় নেই। এরা হল ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ দিয়ে তৈরী। অনেকে বলেন তিনটি বিন্দু দিয়ে তৈরী অর্থাৎ সূর্য চন্দ্র ও অগ্নি।

তরুণ সাধকটি আমার দিকে তাকালেন, অর্থাৎ আমি কিছু বুঝতে পেরেছি কিনা তাই জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন। আমি বললাম, চর্মচক্ষে যদি এদের দেখা না যায় তাহলে এদের সক্রিয় করা যাবে কি করে ?

তিনি বললেন, অনুভবের মধ্য দিয়ে, যৌগিক প্রথাতে।

বললাম, বুঝতে পারলাম না।

তিনি বললেন, পারবেন, তবে এ-জন্য যোগাসনে বসা প্রয়োজন। যোগাসনে বসলেই এদের সক্রিয় করতে পারবেন।

অধ্যাত্ম দর্শনে যোগাসনের প্রয়োজন কি, জানি না। তবে দেহের উপর যে যোগাসনের বিরাট মূল্য আছে তা মানি। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এখন আমাদের দেশে যৌগিক ব্যায়ামের উপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে। অনেক বড়লোক পরিবারের লোকেরাও এখন ডাক্তারের কাছে না গিয়ে যৌগিক ব্যায়ামের আশ্রয় নিচ্ছেন। তাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই অধ্যাত্মসত্য লাভ করা নয়—দেহের মধ্যে যৌবনকে ধরে রেখে ইহজগৎ ভোগ করা। তবে এতে তাদের পার্থিব উদ্দেশ্য যে সাধিত হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। রুশ বিজ্ঞানীরা নাকি যৌগিক ব্যায়ামের তাৎপর্য ধরার জন্য আমাদের দেশে বছর তিনেক এর চর্চা করেছিলেন। তাদের ধারণা এটা অবৈজ্ঞানিক। অবৈজ্ঞানিক কি বৈজ্ঞানিক জানি না, তবে আমি নিজে পেটের নানা সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার জন্য শেষপর্যন্ত যৌগিক ব্যায়াম করে দেখেছি উপকার পেয়েছি। তাছাড়া যৌগিক ব্যায়াম করে মনের মধ্যে স্থিরতা বোধ করছি। যৌগিক ব্যায়াম করলে মনে যে কোন কুচিন্তা স্থান পায় না এটা বেশ বুঝতে পারি। দেহমনে একটা অব্যক্ত আনন্দও অনুভব করা যায়। তবে যৌগিক ব্যায়াম দ্বারা দেহের এই সূক্ষ্ম নাড়িগুলিকে সক্রিয় করে অধ্যাত্ম লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় কি না জানি না। তন্ত্র বর্ণিত শক্তিও দেহের মধ্যে জাগরিত হয়ে উর্ধ্বদিকে প্রবাহিত হয় কি না বলতে পারব না। আমি তরুণ সাধকটিকে বললাম : কিভাবে যৌগিক প্রথায় এই নাড়িগুলিকে সক্রিয় করা যায় ?

তিনি বললেন, আপনাকে তাও নিশ্চয়ই জানতে হবে। তবে

তার আগে নাড়ি সম্পর্কে আর একটু শুনে নিন। চক্র সম্পর্কে জেনে নিন, যোগাভ্যাস তারও পরে। এই নাড়ির কথাই আর একটু বলছি শুনুন। এই যে তিনটি প্রধান নাড়ির কথা বললাম, এ ছাড়াও আরও অসংখ্য শিরা ও ধমনী আছে শরীরের মধ্যে। তবে কি জানেন, এদের সবাই প্রাণশক্তির বাহক নয়। তবে সুষুম্না, ঈড়া ও পিঙ্গলা ছাড়াও আরও এগারটি গুরুত্বপূর্ণ নাড়ি আছে দেহের মধ্যে। যেমন ধরুন, কুহু, গান্ধারী, হস্তী-জিহ্বা, সরস্বতী, পূষা, পয়স্বিনী, শঙ্খিনী, যশস্বিনী, বারুণা বিশ্বোদরা ও অলম্বুষা। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে এদের সম্পর্কে না জানলেও চলে। প্রথম বেশী জানতে গেলে সবটাই হয়তো জড়িয়ে পাকিয়ে যেতে পারে। বরং তার আগে ঐ যে দেহের চক্রের কথা বলছিলাম, সেই চক্রগুলো কি তাই বলা যাক।

তরুণ সাধকটি আমাকে দেহের নাড়ি-জ্ঞান দেবার জন্য যে ধ্যানরত সাধকের চিত্রটি এঁকেছিলেন, মুহূর্তের মধ্যে তা মুছে ফেলে সে-জায়গায় নতুন আর একটি উপবিষ্ট সাধকের রেখাচিত্র আঁকলেন। তারপর সেই সাধকের গুহ্যদ্বারের সামান্য কিছু উপর থেকে ভ্রূ-যুগলের মাঝ বরাবর একটা রেখা টেনে কম বেশী নানা দল সহকারে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পাঁচটি পদ্মের আলপনা আঁকলেন। আমি এখানে এসে মঠের বারান্দায় যে রঙবেরঙের পদ্ম দেখেছিলাম এ পদ্মগুলি সেরকম নয়। পদ্মের শুধু দলগুলোই আঁকলেন তিনি আর কিছু নয়। তারপর পদ্মের নিচে নিচে কতকগুলি নাম লিখলেন। নিচ থেকে উপরে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পড়ে দেখলাম এইভাবে পদ্মগুলি সাজানো হয়েছে—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ। দুই ভুরুর মধ্যে শুধু দ্বিদল এক পদ্ম আঁকলেন, তার নিচে লিখলেন—আজ্ঞা। ছবিটি এঁকে তিনি আমার দিকে তাকালেন, বললেন, এই হল চক্র বুঝলেন ?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, বুঝিনি। আপনি ছবি আঁকলেন তাই দেখলাম।

তিনি হেসে বললেন, অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝবেন।

বললাম, কি করে জানলেন যে, বুঝব ?

—এ যে আপনার প্রাক্তন। আপনার মধ্যে সুপ্ত আছে, তাই বুঝবেন। জীবনে হয়তো অনেক কাজ করেছেন যা সচেতন মনে আপনি ভুলে আছেন। কিন্তু আপনার সচেতন মন ভুললেই যে আপনার মধ্য থেকে তা হারিয়ে যায়, তা নয়। অবচেতন মন, বা অচেতন মনের স্তরে তা থাকে। আপনাদের ফ্রয়েড সাহেবও তো তাই বলেছেন, বলেননি ?

আমি কোন জবাব দিলাম না।

তিনি বললেন, অতীতে ঘটেছিল এমন কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখলে যেমন বিস্মৃত অতীতের কাহিনী মনে পড়ে যায়, তেমনই প্রাক্তন জীবনে আপনি যা করেছিলেন, তার সামান্য অনুশীলনীতেই আপনার তা মনে পড়তে পারে। বিশেষ করে অধ্যাত্ম সাধনার যোগসূত্রগুলি খুব তাড়াতাড়ি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

বললাম, অনেকেই আমার মধ্যে প্রাক্তন অধ্যাত্ম জীবনের ছায়া দেখতে পান। কিন্তু আমি নিজের মধ্যে অনেক নীরব মুহূর্তে একটা অতিপ্রাকৃত ছোঁয়া পেলেও তার যাথার্থ ধরতে পারি না। সে প্রাক্তন যে কোথায় কিভাবে ঘুমিয়ে আছে, আমার সত্যি ভারি আশ্চর্য লাগে !

তরুণ সাধকটি বললেন, চোখে যার ছানি পড়েছে, ছানি না কাটালে সে দেখবে কি করে বলুন ! যে পর্দা প্রাক্তন জীবন থেকে আপনাকে সরিয়ে রেখেছে সেই পর্দাটাকে সরিয়ে দিতে হবে।

খুব আগ্রহভরে সেই তরুণ সাধকটির দিকে তাকালাম। তিনি আমার সেই সাগ্রহ দৃষ্টির অর্থ বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেললেন। তাই বললেন, না, না, পর্দা সরিয়ে দেবার মালিক বাইরের কোন লোক নয় জানবেন। এ ছানি অপারেশন করবার ডাক্তার আপনি নিজে। অপরে শুধু আপনাকে আপনার ছানির কথা জানিয়ে দিয়ে অপারেশনের যন্ত্রপাতি এগিয়ে দেবে। কোন সাধক অলৌকিক ক্ষমতা-বলে আপনার প্রাক্তন জীবনকে আপনার কাছে উদ্ভাসিত করবে এ-কথা কস্মিনকালেও ভাববেন না। নিজে জানলে তবেই জানা হয়, অপরে

জানালেই হয় না। এইজন্যই তো আমাদের শাস্ত্র বার বার জোর দিয়ে বলেছে, আত্মানং বিদ্ধি।

—তাহলে···! আমি কি যেন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম।

তরুণ সাধকটি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, প্রশ্ন করবেন পরে। আগে চক্ররহস্য জেনে নিন।

—'বলুন!' আমি আগ্রহভরে তাঁর দিকে তাকালাম।

সাধকটি বললেন, মানবদেহের মধ্যে যে তত্ত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্ম ধারক-গুলি প্রাণপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত সেই তত্ত্বগুলি শরীরের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে আছে। তত্ত্বগুলির আঞ্চলিক অধিষ্ঠান ক্ষেত্রকেই বলা হয় দেহের চক্র। চক্রগুলি রয়েছে মেরুদণ্ডের ভেতরে।

একটু বাধা দিতে বাধ্য হলাম। তত্ত্ব জিনিসটার স্বরূপ বুঝতে না পারলে সবটা কেমন অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছিল। তাই বললাম,

—একটু বাধা দিচ্ছি।

—বলুন।

—এই তত্ত্ব জিনিসটি কি যদি একটু স্পষ্ট করে বলেন—

সামান্য একটু হেসে তরুণ সাধকটি বললেন, তত্ত্ব বলতে আপনারা বোঝেন **Principle**, কিন্তু তন্ত্রের মতে **Basic Principle** বা মৌল পদার্থ যা থেকে জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি! এই মৌল পদার্থকে নানা মতে নানাভাবে ভাগ করা হয়েছে। সাংখ্য মতে তত্ত্ব বা জগৎ সৃষ্টির **Basic Principle** আছে ২৪টি। তন্ত্রমতে ৩৬টি। তবে এর সংখ্যা নিয়ে মতভেদও আছে। তত্ত্ব যে শুধু পদার্থই তা নয়। অতি-পদার্থ বা পদার্থের অতীত জিনিসও হতে পারে। সৃষ্টির মূল যে প্রকৃতি তিনিই হলেন প্রথম তত্ত্ব। তবে তত্ত্ব নিয়ে, তত্ত্বের সংখ্যা নিয়ে নানা মতভেদ আছে! এবার নিশ্চয়ই বুঝেছেন।

বললাম, অনুমান করতে পারছি, আপনি বলুন।

তরুণ সাধকটি বলতে আরম্ভ করলেন, মানবদেহের নানা অংশে বিভিন্ন উপাদান বা তত্ত্বের প্রাধান্য রয়েছে। মেরুদণ্ডের ভেতরে বিভিন্ন স্তরে সেই উপাদান বা তত্ত্বগুলির এক একটির প্রাধান্য।

জীবনপ্রবাহ বা শক্তি এক একটি তত্ত্ব বা চক্রের মধ্যে বিভিন্নরূপে রয়েছে। মানুষের ব্রহ্মরন্ধ্র বা সহস্রার হল তত্ত্বগুলির উৎসক্ষেত্র। অর্থাৎ সৃষ্টির উৎস রয়েছে সেখানে। ধরা যাক, দেহটা হল মহাবিশ্বের কেন্দ্র। সেখান থেকে স্তরে স্তরে পুরুষের ইচ্ছা নেমে এসেছে বস্তু তৈরি করার জন্য। এক একটি স্তর হল সেই পরম ইচ্ছার এক একটি তরঙ্গ। তন্ত্রের মতে ৫১টি বর্ণাক্ষর অর্থাৎ ইচ্ছাতরঙ্গে শেষপর্যন্ত বস্তুর আবির্ভাব। এই বস্তুর মধ্যেও তরঙ্গ আছে। বিজ্ঞান আজ তা আবিষ্কার করেছে। দেহে এতগুলি স্তর বা তরঙ্গ কল্পনা করা হয়নি। ঊর্ধ্ব থেকে ছয়টি বিভিন্ন স্তর আছে দেহ-ব্রহ্মাণ্ড তৈরির মূলে। এই স্তরকেই বলা হয় ষড়তত্ত্ব বা ষটচক্র।

তরুণ সাধকটি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু বুঝতে পারছেন ?

বললাম, কিছুটা অনুমান করতে পারছি, আপনি বলুন !

তরুণ সাধকটি বললেন, সহস্রার থেকে দেহতত্ত্ব নেমে তার শেষ তরঙ্গ বা তত্ত্ব তৈরি করেছে মূলাধারে। গুহ্যদ্বার-এর কিছু উঁচুতে ও লিঙ্গমূলের কিছু নিচুতে তিনি একটি স্থান দেখিয়ে বললেন, এই এখানে হল শেষ চক্র, মূলাধার। কারো কারো মতে অবশ্য এর নিচেও অর্থাৎ পাদদেশ পর্যন্ত আরও কয়টি স্তর আছে, যেমন ছয়টি স্তর। মূলাধারকে ধরা হয়েছে মৃত্তিকা, তার নিচে পাদদেশ হল পাতাল। স্তরে স্তরে গভীর নিচু অবধি নেমে যাওয়া পাতাল। কিন্তু যে তিনটি প্রধান নাড়ির কথা আমরা বলেছি পাতালের সঙ্গে সেই নাড়িগুলির কোন সম্পর্ক নেই। এদের আরম্ভ হল মূলাধার চক্র থেকে। তান্ত্রিকেরা প্রতীকের মাধ্যমে মূলাধার চক্রকে দেখেছেন এইভাবে। তিনি বারান্দায় প্রথম যে ছবিটি এঁকেছিলেন সেই ছবিটি দেখিয়ে দিলেন।

আমি আর একবার সেই রঙবেরঙের আলপনা আঁকা ছবিটি তাকিয়ে দেখলাম। এই ধরনের সঙ্কেতপূর্ণ ছবি আঁকার তাৎপর্য কি, এতক্ষণে আমার কাছে তা পরিষ্কার হল।

তরুণ সাধকটি বললেন, সমস্ত বস্তু অর্থাৎ নাড়িরই সঙ্গমস্থল হল

এই মূলাধার। ঊর্ধ্ব দেহের একেবারে নিচে, কিন্তু সমগ্র দেহের মধ্যস্থলে।

আমি বললাম, মেরুদণ্ডের এই অংশে কি সত্যিই এমন ধরনের কোন চক্র আছে নাকি ?

সাধুটি হেসে বললেন, এ হল প্রতীক। এই যে এত প্রতিমা, যথার্থ সেরকম আছে নাকি ? অর্থাৎ যার কথা বলতে চাই তার প্রতিম হল প্রতিমা। প্রতিমা শব্দই তো বলে দেয় যে সে সত্য নয়।

বললাম, আমি শুনেছি, অনেক সাধকই প্রতিমার অনুরূপ অলৌকিক শক্তির সাক্ষাৎ পান। রামকৃষ্ণ মা কালীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

সাধকটি বললেন, অসম্ভব কিছুই নয়। জগৎকে জানার তিনটি পদ্ধতি আছে। একটি জ্ঞানের পদ্ধতি, এ-পথে জগৎকে দেখলে অসার ও অনিত্য মনে হয়। জগৎপ্রপঞ্চে ব্যক্ত শক্তিকে মনে হয় মায়া। শঙ্করাচার্য এই দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। কেউ বা প্রেমের মধ্যে, ভালবাসার মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতির মূলে সক্রিয় শক্তিকে দেখতে চান, তাঁরা শক্তিকে তখন দেখেন রাধা হিসেবে। কেউ বা জগৎ-কারণ শক্তিকে নিজেদের ইচ্ছানুরূপ দেখতে চান, তাঁরাই হলেন শক্তি উপাসক। ইচ্ছা শক্তিকে যদি হৃদয়ে জাগারিত করতে পারেন তা হলে আপনি যেমন ইচ্ছা করেন, তেমনই দেখবেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব চতুর্ভুজা কালী মূর্তিতে শক্তিকে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই দেখেছিলেন। আবার তিনি যখন জ্ঞানের মধ্যে শক্তিকে বুঝতে চেয়েছিলেন তখন মায়ার মধ্যেই তাঁকে দেখেছিলেন। কালীর যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বচ্ছ ধারণা ছিল। তাই কেশবচন্দ্রকে বলেছিলেন, ৺মা তোমার কাছে ছোট একটা মূর্তি হিসেবে প্রতীয়মান হন কারণ তুমি ৺মাকে দূর থেকে দেখছ বলে। সূর্যকে যেমন দূর থেকে দেখ বলে তা ছোট দেখায় তেমনি। কাছে গেলে অর্থাৎ মাতৃতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব কারো কাছে পরিষ্কার হলে তখন তাঁকে সীমার অতীত দেখায়। যিনিই সীমার মধ্যে তিনিই সীমার অতীত। তাই শঙ্করাচার্যের মত মায়াবাদীও

বলেছেন যে 'মূর্তামূর্তম।' অর্থাৎ তিনি মূর্ত তিনিই অমূর্ত। দ্বৈত ও অদ্বৈতের এই খেলার কথাই রামানুজ তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনে ব্যাখ্যা করে গেছেন।

ডঃ রাধাকৃষ্ণের **Indian philsophy**-তে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ সম্পর্কে একবার পড়েছিলাম। সেই কথাটি মনে পড়ে গেল। বললাম, তাহলে মূলাধার হল একটা ভাব প্রকাশক শিল্পমাত্র ?

তরুণ সাধকটি বললেন, যথার্থ ই তাই। অতিস্থূল জগতে শক্তির যে উপাদান যেখানে বেশী সেই উপাদানকে বোঝাবার জন্যই এই চিত্ররূপ কল্পনা। যথার্থ ই কোন স্থূল উপাদান নিয়ে এটা গড়া নয়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে হাজারো খুঁজলেও এর কোন সন্ধান পাবেন না। এমনকি মূলাধারে বিশেষ কোন জটিল গ্রন্থিও দেখতে পাবেন না, এ হল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এখানে শক্তি বা ইচ্ছার বিশেষ একটা চেতনাতরঙ্গ রয়েছে।

বললাম, বেশ কৌতূহল বোধ করছি। এই মূলাধার সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে একটু ব্যাখ্যা করে বলুন।

সাধকটি আবার বলতে আরম্ভ করলেন। আলপনার ভঙ্গীতে আঁকা মূলাধারটি দেখিয়ে তিনি বললেন, রক্তবর্ণ মূলাধারের চারটি দল বা পাপড়ি আছে। এই পাপড়িগুলি যথার্থই কোন পাপড়ি নয়, এক একটি চৈতন্যের প্রতীক। তান্ত্রিকরা বলেন এই চারটি পাপড়ি হল— পরমানন্দ, সহজানন্দ, যোগানন্দ ও বীরানন্দের প্রতীক। দেখুন, সোনার রঙের অক্ষরে চারটি পাপড়ির উপরে লেখা আছে, বং, শং, ষং ও সং। জিজ্ঞাসা করলাম, এই চারটি স্বরবর্ণের ইঙ্গিত কি ?

তরুণ সাধকটি জিজ্ঞাসা করলেন, শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে আপনি তো কিছু জানেন ?

মনে পড়ে গেল হিমালয়ের আঙিনায় তুধচটির পথের ধারে দেখা সেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধকের কথা। তিনি আমাকে শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন। শব্দেরও আছে কয়েকটি পর্যায়, যেমন, নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে শব্দ যখন একাত্ম, তাঁর থেকে অবিচ্ছেদ্য, তখন

শব্দও ব্রহ্মাণ মাত্র। শব্দ তখন নিবিড় নৈঃশব্দ্য। সহজাত গুণেই যেমন ব্রহ্মাণের মধ্যে ইচ্ছা তরঙ্গের বিস্তার, তেমনি বিস্তার শব্দেরও। ব্রহ্মাণের বস্তুরূপে আত্মপ্রকাশের ধাপে ধাপে তার সঙ্গে এসেছে শব্দও। ব্রহ্মাণ যখন মহামানসে তখন শব্দ নিঃশব্দ। ইচ্ছার অভিঘাতে ব্রহ্মাণে আলোড়ন হলে শব্দের মধ্যেও আলোড়ন দেখা দেয়। এই আলোড়ন ভূত পর্যায়ে এসে হয় অব্যক্ত শব্দ থেকে ব্যক্ত শব্দ। যেমন ব্যোম। ব্যোম যখন ব্যক্ত, শব্দও তখন ব্যক্ত। শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই আসে অর্থও। এবং তার মধ্যেই থাকে রূপ। বিশ্বজগতের যেমন আছে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থা, তেমনই আছে শব্দেরও। শব্দ আত্মপ্রকাশ করেছে চারটি স্তরে পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী।

আত্মপ্রকাশের মুখে শব্দের যে অবস্থা সেই হল শব্দের পরা-অবস্থা। পরা অবস্থায় শব্দ এক অদ্ভুত নিশ্চল 'কারণ'-অবস্থায় থাকে। পশ্যন্তি হল সেই শব্দ যার মধ্যে প্রথম প্রকাশের জন্য স্পন্দন সবে মাত্র দেখা দিয়েছে। এর পরেই শব্দের মধ্যমা অবস্থা, অর্থাৎ শব্দ তখন মানস পর্যায়ে, শুধুমাত্র মনের দ্বারাই জ্ঞাত। শব্দের তখন সূক্ষ্ম শরীর। শব্দের অর্থও তখন সূক্ষ্ম। শব্দ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় তখনই হল বৈখরী শব্দ। দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে শব্দের এক একটি পর্যায়। মূলাধারে শব্দের পরাপর্যায়, জঠরে পশ্যন্তি অঞ্চল, হৃৎপিণ্ডে মধ্যমা অঞ্চল, মুখে এসে শব্দ বৈখরী শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শব্দ সম্পর্কে সেই কথাগুলো আমার মনে পড়ে গেল। তাই বললাম, শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুটা শুনেছিলাম, তাই সামান্য অনুমান করতে পারি।

তরুণ সাধকটি বললেন, যতক্ষণ আকাশের কোন পাখিকে যথাযথ হাতে ধরা না যায়, ততক্ষণ পাখি সম্পর্কে ধারণার অনেকটাই অনুমান। হাতে ধরা পড়লে, পাখি পোষ মানলে তবেই তার সম্পর্কে হয় স্পষ্ট ধারণা। যতক্ষণ না এ-সব ধরতে পারছেন ততক্ষণ সবকিছুকেই অনুমান বলে বোধ হবে। 'মিষ্টি' চোখে দেখলে এবং তার গুণাগুণের

কথা শুনলে অনুমানই করা যায় শুধু, ধারণা হয় না. তাকে যথার্থ জানা যায় না। এসব যখন ধরতে পারবেন, তখনই আসল জানা হবে, নয়তো অনুমানই থাকবে।

বললাম, কি করে ধরা যাবে ?

—হাত থাকলেই তো হাতের মধ্যে কিছু ধরা যায় না, ধরতে হলে হাত মুঠ করতে হয়। তেমনি যা জানছেন তাকে ধরতে হবে সমস্ত বোধ দিয়ে। এই ধরার কৌশল জানা চাই।

—সে কৌশল কি ?

—সে কৌশলের নামই হল যোগ। এটা বক্তৃতার ব্যাপার নয়। হাতে নাতে শেখার ব্যাপার। সে অনেক পরের কথা, এবার যা বলছিলাম, শুনুন।

আমি সাগ্রহে সাধকটির মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি বলতে লাগলেন, সেই যে স্বরবর্ণের কথা বলছিলাম। বর্ণ হল তরঙ্গ। তরঙ্গের তারতম্যেই বর্ণভেদ জানেন তো ? এই বর্ণকে যখন রেখা দিয়ে ধরা হয়, তখন তা অক্ষর। সুতরাং মূলাধারের চতুর্দিকে এই যে অক্ষর দেখছেন—এর এক একটি অক্ষর হল এক একটি মন্ত্র। আর মন্ত্র মানেই দেবতা।

—বললাম, মন্ত্র মানেই দেবতা ?

—হ্যাঁ।

—যেমন ?

—সাধকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেবতা শব্দের অর্থ কি ?

বললাম, শুনেছি, 'দিব' ধাতু থেকে দেব শব্দ। যিনি দান করেন তিনিই দেবতা।

—মন্ত্র অভীষ্ট দান করে, ফলে মন্ত্রও দেবতা।

—মন্ত্র অভীষ্ট দান করে !

—হ্যাঁ।

—কই, এখন তো সেরকম দেখি না ?

—মন্ত্র উচ্চারণের কলাকৌশল লোকে ভুলে গেছে বলেই তা হয় না।

দুটি পাথরে ঠুকুন, দেখবেন শব্দ হবে, আগুন জ্বলবে। যথার্থ অভিঘাতে উচ্চারিত হলে শব্দ তার অর্থ প্রদান করে।

জিজ্ঞাসা করলাম, মূলাধার চক্রের এই যে ব, শ, ষ, এবং স-এর তাৎপর্য কি?

সাধকটি বললেন, শব্দের আরম্ভ স্বরবর্ণ দিয়ে, শেষ ব্যঞ্জনবর্ণে। মূলাধারের শব্দগুলি শব্দ পর্যায়ের শেষের দিকের। অর্থাৎ শব্দতরঙ্গের শেষপর্যায়ের। মূল থেকে যত দূরে ততই স্থূল। পৃথিবী হল স্থূলতম। শেষ পর্যায়ের তরঙ্গ তাই শব্দের শেষ পর্যায়ে রয়েছে এখানে। এই চারটি শব্দ স্থূল জগতের শক্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দেহের মধ্যে যে-প্রাণবায়ু প্রাণ-শক্তি হিসেবে রয়েছে, পদ্মের বা চক্রের পাপড়িগুলো হল তারই প্রতীক। পাপড়ির উপর এক একটি অক্ষর হল এক একটি বিশেষ শক্তির প্রতীক। মূল দেবতাকে আবৃত করে রেখেছে। মূল দেবতার শক্তিকেও ঢেকে রেখেছে। মূল শক্তি হল কুণ্ডলিনী মা। কুণ্ডলিকৃত অবস্থায় দেহের মধ্যে বস্তুর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। এরা অর্থাৎ এই অক্ষরগুলো সেই কুণ্ডলিনীশক্তির বাহ্য প্রকাশ। এরা সবাই মিলে গঠন করেছে কুণ্ডলিনীশক্তির মন্ত্রদেহ। শক্তি কুণ্ডলিনী হলেও জ্যোতির্ময়ী ও কেন্দ্রময়ী উভয়ই। যে অক্ষরে জপ করা হয় তা হল শক্তির স্থূল প্রকাশ। জ্যোতির্ময়ী-রূপে দেবী সূক্ষ্ম। মন্ত্রময়ী-রূপে স্থূল দেহের বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টির যে তত্ত্ব রয়েছে তার শক্তিকে প্রকাশ করে এই মন্ত্রগুলি। এই মূলাধার হল দেহের মধ্যে পৃথ্বীতত্ত্বের কেন্দ্র। অর্থাৎ দেহের এই অঞ্চলে স্থূল শক্তিই প্রবল। এই চক্রের বীজ বা মন্ত্র হল 'লং' যা লেখা রয়েছে চক্রমধ্যে। পৃথ্বী তত্ত্বের বীজ হল 'ল'। এর সঙ্গে উনস্বর হিসেবে যুক্ত রয়েছে বিন্দু (সংস্কৃত উনস্বর একটা বিন্দু মাত্র, বাংলার মত নয়)। বিন্দু অর্থ হল ব্রহ্মচৈতন্য। এই ব্রহ্মচৈতন্য লং হিসেবে সমগ্র চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে বিরাজমানা রয়েছেন। লং হল সূক্ষ্ম শব্দের বৈখরী রূপ। এই চক্রের অর্থাৎ পৃথ্বীতত্ত্বের অর্থাৎ স্থূল দেহের কম্পন থেকেই এর সৃষ্টি। বিভিন্ন বায়ুর কম্পন থেকে যে-ভাবে এর সৃষ্টি, উচ্চারণকালে

দেহের অভ্যন্তরের সেই সব বায়ুকে যদি তেমনভাবেই কাঁপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে লং শব্দ পৃথ্বীতত্ত্বের সমস্ত ফলই দেবে। বায়ুতে বায়ুতে সঠিক আঘাতেই শব্দ তার যথার্থ ফল দান করে। দুটো বিশেষ বায়ুর সজ্ঘর্ষে আগুন জ্বলে, আবার বিশেষ বিশেষ বায়ুর সংঘাতে জলও হয়। ইচ্ছা তরঙ্গের তারতম্যে স্থূল অস্থূল সবই হওয়া সম্ভব।

দেখুন, মূলাধার চক্রের বীজ দাঁড়িয়ে আছে হস্তীর উপর। এই হস্তীর নাম ঐরাবত। হস্তী হল ঘনত্ব, শক্তি ও দৃঢ়তার প্রতীক। এইজন্যই সে হল পৃথ্বীতত্ত্বের প্রতীক। পৃথ্বীতত্ত্বের বীজমন্ত্র হল ইন্দ্রের। ইন্দ্র মানেই ঐ ঐরাবত। মূলাধারের চক্রদেবতা হলেন স্রষ্টা ব্রহ্মা। পৃথ্বীতত্ত্বের বীজের মধ্যে যে 'লং' রয়েছে, দেবনাগরী অক্ষরে, দেখবেন এই লয়ের মাথার উপর উনস্বররূপে আছে বিন্দু। এই বিন্দুর মধ্যে রয়েছে শিশুরূপী চতুর্মুখ ও চতুর্ভুজ ব্রহ্মা। ব্রহ্মার শক্তিকে বলে সাবিত্রী। এই মূলাধার চক্রেই আর এক শক্তি রয়েছে, যাকে বলে ডাকিনী। এই ডাকিনী শক্তি হল ধাতু দিয়ে গড়া যে দেহ সেই ধাতু-দেহের শক্তি। এর মধ্যেই দেখুন রয়েছে ত্রিকোণ যোনি। এর নাম ত্রৈপুর—যাকে বলা হয় শক্তিপীঠ। এর উপরেই স্থাপিত রয়েছে পুরুষের প্রতীক শিবলিঙ্গ। একে বলে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। এর আকৃতি আর রঙ হল কচি কলাপাতার মত। এই যোনি আর লিঙ্গ প্রকাশ করেছে—মায়াশক্তি ও চিৎশক্তিকে।

লিঙ্গ আছে চাররকম—স্বয়ম্ভু, বান, ইতর ও পরলিঙ্গ। চৈতন্যের দিকে পরিচালিত করে বলেই এঁদের এই নাম। এই লিঙ্গগুলিই হল পীঠ। কামরূপ এবং অন্যান্য পীঠ। কারণ এঁরাই চৈতন্যকে প্রকাশ করে—চিৎস্ফুরত্তাধারৎবাদ। এঁরাই হলেন অহংকার, বুদ্ধি ও চিত্তের বৃত্তি। স্বয়ম্ভু, বান ও ইতর লিঙ্গে রঙ ও আকৃতি আছে। যেমন হলুদ, লাল ও সাদা। আকৃতি ত্রিকোণ বা বৃত্তাকার। এঁদের সঙ্গেও যুক্ত আছে কিছু অক্ষর যেমন ক থেকে ত পর্যন্ত কোমল বর্ণ ও থ থেকে স পর্যন্ত অক্ষর। এর পরের লিঙ্গ হল আকৃতিহীন, বর্ণহীন, অক্ষরহীন। শেষ লিঙ্গে সমস্ত অক্ষর রয়েছে সমষ্টিগতভাবে—

পরমানন্দরূপে। ত্রৈপুর হল জীবদেহে সহস্রারের প্রতিরূপ, কামকলা। বিদ্যুতের মত চমকপ্রদ দেবী কুণ্ডলিনী এই চক্রের গহ্বরে উজ্জ্বল আলোর শৃঙ্খল আকারে লিঙ্গ ঘিরে ঘুমিয়ে থাকেন। দেখুন স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে কেমন সাড়ে তিন প্যাঁচে তিনি জড়িয়ে ধরে আছেন। নিজের মুখ দিয়ে ব্রহ্মদুয়ার বা ব্রহ্মদ্বার আবৃত করে আছেন।

আমি মঠের বারান্দায় আঁকা মূলাধার চক্রের অভ্যন্তরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে সাড়ে তিন প্যাঁচে জড়িয়ে থাকা সেই কুণ্ডলিনী সর্পিণীকে দেখলাম। এই স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ও সর্পিণীকেই আমি দুধচটির পথের ধারে সেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধকের পাথরের ছোট ঘরে দেখেছিলাম। তখন এর তাৎপর্য আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। দিশেহারা হয়ে এতদিন এর তাৎপর্য খোঁজার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই অলৌকিক রহস্যের জট যেন এতদিন পরে আমার কাছে খুলে গেল। সেজন্য আমি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

অদ্ভুত একটা শান্ত ও স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সেই তরুণ সাধকটি আমার চোখে চোখ মেলালেন। একটু স্মিত হাসি হাসলেন। যেন তিনি জানতেন আমি এতদিন কিসের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, যেন তিনি জানতেন যে, আমি একদিন ঘুরে ঘুরে তাঁর কাছেই আসব এবং তিনিই আমাকে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দেবেন। তিনি স্মিত হাসি হাসতে হাসতেই একটি শ্লোক বললেন,

অথাধারপদ্মং সুষুম্নাস্যলগ্নং
ধ্বজাধো গুদোর্দ্ধং চতুঃশোণপত্রম্।
অধোবক্ত্রমুদ্যৎ সুবর্ণাভবর্ণৈ
র্বকারাদিসান্তৈর্যুতং বেদবর্ণৈঃ॥

জিজ্ঞাসা করলাম, এ-শ্লোকের অর্থ কি?

তিনি বললেন, এ হল মূলাধারেরই বর্ণনা।

—কি রকম?

তিনি শ্লোকটিকে ব্যাখ্যা করে বললেন, লিঙ্গের অধোদেশে এবং গুহ্যদ্বারের উর্ধ্বদেশে মূলাধার নামক পদ্ম রয়েছে। এই পদ্ম সুষুম্না

নাড়ির মুখে সংলগ্ন রয়েছে। এর চারটি পত্র আছে। পত্রের মধ্যে সোনার মত রঙযুক্ত ব, শ, ষ, স এই চারটি বর্ণ দক্ষিণাবর্তে অবস্থিত আছে। এ হল অধোমুখ। এই ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি আরও একটি শ্লোক বললেন·

অমুষ্মিন্ ধরায়া শ্চতুষ্কোণচক্রং
সমুদ্ভাসিশূলাষ্টকৈ রাবৃতং তৎ।
লসৎপীতবর্ণং তড়িৎকোমলাঙ্গং
তদঙ্কে সমাস্তে ধরায়াঃ স্ববীজম্ ॥

জিজ্ঞাসা করলাম : এর অর্থ ?

তিনি বললেন : এর অর্থ এই পদ্মের কর্ণিকাতে চতুষ্কোণ পৃথিবী-মণ্ডল আছে। এর আটদিকে আটটি প্রকাশমান শূলচিহ্নের দ্বারা আবৃত এই মণ্ডল কান্তিশালী ও পীতবর্ণ। এর অবয়ব বিদ্যুতের মত কোমল। এই ধরামণ্ডলের মধ্যে পৃথ্বীবীজ (লং) অবস্থিত। এই বীজও পীতবর্ণ।

এরপর তিনি আরও একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন :

চতুর্বাহুভূষং গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং
তদঙ্কে নবীনার্কতুল্য প্রকাশঃ।
শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদ্বেদবাহু—
স্মুখাম্ভোজলক্ষ্মীশ্চতুর্ভাগভেদ ॥

—এর অর্থ ?

তিনি বললেন, এর অর্থ, এই বীজ চারটি বাহু দ্বারা ভূষিত ও ঐরাবতে উপবিষ্ট। ধরাবীজের ক্রোড়ে শিশুরূপী সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা অবস্থিত আছেন। এঁর শরীরের আভা বালসূর্যের কিরণের মত। এঁর চার হাত। হাতগুলি শোভাসম্পন্ন। মুখও চারটি। মুখগুলি পদ্মের মত শোভাবিশিষ্ট। কারো কারো মতে চারভাগে বিভক্ত চার বেদই এর মুখপদ্মের শোভাস্বরূপ। 'চতুর্ভাগভেদঃ' না বলে বলতে হবে 'চতুর্ভাগবেদঃ'।

তরুণ সাধকটি এর পর আরও একটি শ্লোক বললেন :

বসেদত্র দেবী চ ডাকিন্যাভিখ্যা

লসদ্বেদবাহুজ্জ্বলা রক্তনেত্রা।

সমানোদিতানেকসূর্য্যপ্রকাশা

প্রকাশং বহন্তী সদা শুদ্ধবুদ্ধেঃ ॥

—এর অর্থ?

সাধু বললেন, এর অর্থ, এই পদ্মে ডাকিনী নাম্নী দেবীও বাস করেন। এঁর চার বাহু। ইনি উজ্জ্বল এবং চক্ষু রক্তবর্ণ। শরীরের আভা এককালীন সমুদিত বহু সূর্যের কিরণের মত। ইনি সর্বদা তত্ত্ব-জ্ঞানে প্রকাশ বহন করছেন। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করছেন।

তরুণ সন্ন্যাসীটি এবার আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন :

'বজ্রাখ্যাবক্ত্র-দেশে বিলসতি সততং কর্ণিকামধ্যসংস্থং

কোণং তৎ ত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিববিলসৎ কোমলং কামরূপম্।

কন্দর্পো নাম বায়ুর্নিবসতি সততং তস্য মধ্যে সমন্তাৎ

জীবেশো বন্ধুজীবপ্রকরমভিহসন্ কোটিসূর্য্য প্রকাশঃ ॥

—এর অর্থ?

তিনি বললেন এর অর্থ, সুষুম্না নাড়ির মূল থেকে দু' আঙুল ঊর্ধ্বে ও লিঙ্গমূলের অধোদেশে বজ্রানাড়ির মুখ। এই নাড়ি মূলাধার পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অবস্থিত গহ্বরের মধ্যবর্তী। এখানে ত্রৈপুর নামে প্রসিদ্ধ ত্রিকোণ সর্বদা অবস্থান করছে। এই ত্রিকোণ বিদ্যুতের মত সমুজ্জ্বল ও কোমল। একে কামের অধিষ্ঠান প্রদেশ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এই ত্রিকোণ ধরা-বীজের উপরে অবস্থিত। এই ত্রিকোণের মধ্যে সর্বত্র কন্দর্প নামে বায়ু সর্বদা বাস করে। এই বায়ু কোটি সূর্যের প্রকাশের মত দীপ্তিমান ও বান্ধুলী পুষ্পদের উপহাস করে। অর্থাৎ অত্যন্ত রক্তবর্ণ। এই বায়ুকেই দেহের মধ্যে অবস্থিত জীবের ধারক বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

আর একটি শ্লোক বললেন তরুণ সন্ন্যাসীটি :

'তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুতকনক-কলাকোমলঃ পশ্চিমাস্যো

জ্ঞানধ্যানপ্রকাশঃ প্রথমকিশলয়াকাররূপ স্বয়ম্ভুঃ।

বিদ্যুৎপূর্ণেন্দুবিম্বপ্রকরকরচয়স্নিগ্ধসন্তানহাসী
কাশীবাসী বিলাসী বিলসতি সরিদাবর্ত্তরূপপ্রকারঃ ॥

—এর অর্থ ?

তরুণ সাধকটি বললেন, পূর্বোক্ত ত্রিকোণের মধ্যে কিছুটা উপরের দিকে লিঙ্গাকার পশ্চিমাস্য অর্থাৎ অধোমুখ 'স্বয়ম্ভু' নামক শিবলিঙ্গ আছেন। ইনি গলিত স্বর্ণাবয়ব সদৃশ কোমল। এঁর আকার অচিরোৎপন্ন পত্রাঙ্কুরের মত, অর্থাৎ মূলভাগ স্থূল ও অগ্রভাগ সূক্ষ্ম এবং শ্যামবর্ণ। ইনি বিদ্যুৎ ও পূর্ণচন্দ্রবিম্ব এই দুইয়েরই প্রকৃষ্ট কিরণসমূহকে উপহাস করেন অর্থাৎ এদের তুল্য বিকাশশালী। ইনি কাশীবাসী শিবের মত বিলাসশালী হয়ে শোভা পাচ্ছেন। এঁর আকার নদীর আবর্তের মত। জ্ঞান ও ধ্যান এই দুয়ের দ্বারাই এর প্রকাশ হয়।

এবার তরুণ সন্ন্যাসীটি যে শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন, তাতে রীতিমত চমক বোধ করলাম আমি। কারণ এ শ্লোকটি আমার ছোটবেলায় স্কুলের পণ্ডিত মশাইয়ের মুখে শুনেছিলাম। দুধচটির পথের ধারের সেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সন্ন্যাসীটিও এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন। শ্লোকটি এই :

তন্মধ্যে বিসতন্তু সোদরলসৎ সূক্ষ্মা জগন্মোহিনী
ব্রহ্মদ্বারামুখং মুখেন মধুরং সংছাদয়ন্তী স্বয়ম্।
শঙ্খাবর্ত্তনিভা নবীনচপলামালাবিলাসাম্পদা
সুপ্তা সর্পসমা শিবোপরিলসৎসার্দ্ধত্রিবৃত্তাকৃতিঃ ॥
কূজন্তী কুলকুণ্ডলী চ মধুরং মত্তালিমালাস্ফুটং
বাচঃ কোমলকাব্যবন্ধরচনাভেদাতিভেদক্রমৈঃ।
শ্বাসোচ্ছ্বাসবিভঞ্জনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্য্যতে
সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপ্তাবলিঃ ॥

শ্লোকটি বলা হলে সাগ্রহে সাধকটির মুখের দিকে ব্যাখ্যা শোনার জন্য তাকিয়ে থাকলাম। ছোটবেলা থেকে এই শ্লোকটি স্মৃতির সঙ্গে জড়িত থাকাতে একে অপূর্ব রহস্যময় বলে বোধ হতে লাগল।

ভাবতে লাগলাম না জানি এর কি চমকপ্রদ ব্যাখ্যা আছে। তরুণ সাধকটি এর ব্যাখ্যা দিলেন এই ভাবে: শিবলিঙ্গের ঊর্ধ্বদেশে মৃণালসূত্রের মত সূক্ষ্মতমা কুণ্ডলিনী দেবী শোভা পাচ্ছেন। ইনি জগতের মোহকারিণী অর্থাৎ মায়াময়ী। এঁর প্রভাবেই জন্তুগণ সংসারসাগরে নিমগ্ন থাকে। স্বয়ম্ভূলিঙ্গের ছিদ্র নিজের মুখের দ্বারা মৃদুভাবে আচ্ছাদন করে ইনি শঙ্খের আবর্তের মত অবস্থান করছেন। এঁর জ্যোতি অভিনব বিদ্যুৎপুঞ্জের মত। ইনি প্রসুপ্ত সর্পের মত। শোভমান অর্ধত্রিবৃত্তাকারে অর্থাৎ সাড়ে তিনপ্যাঁচে নিজেকে বেষ্টন করে আছেন। ইনি মত্তভৃঙ্গশ্রেণীর মত অস্পষ্টভাবে মধুর শব্দ করে সুকুমার কাব্য ও পদ্য প্রভৃতি বন্ধ এবং এদের নানারকম সূক্ষ্মতম ভেদবিশিষ্ট বাক্য উৎপাদন করে মূলাধার পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে অবস্থিত ত্রিকোণ গহ্বরে বাস করেন। এজগতের সকল জীবের শ্বাসপ্রশ্বাস বিভাগ করে দেহের অবস্থান ক্রিয়া এঁর দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এঁর দীপ্তি অত্যন্ত সমুজ্জ্বল।

এতদিনে সংস্কৃত সেই শ্লোকটির ব্যাখ্যা আমার কাছে স্পষ্ট হবার জন্য আমি যেন পরিতৃপ্ত দৃষ্টি ফেলে মঠের বারান্দায় আঁকা স্বয়ম্ভূশিবের দেহ জড়িয়ে ধরে থাকা সাপটিকে দেখতে লাগলাম। এই তাহলে সাপ! কিন্তু—

কিন্তু আমার সন্দেহের কথা ব্যক্ত করার আগেই তরুণ সাধকটি আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন:

'তন্মধ্যে পরমা কলাতিকুশলা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরা
নিত্যানন্দপরম্পরাতিবিগলৎ পীযূষধারাধরা।
ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহমেব সকলং যস্তাসয়া ভাসতে
সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধোদয়া॥

নতুন এই শ্লোকটির অর্থ জানবার জন্য আমি সাধকটির চোখের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন,—এর অর্থ, তার মধ্যে অবস্থিত স্বয়ম্ভূলিঙ্গে কুণ্ডলিনী বেষ্টনীর ঊর্ধ্বস্থানে, কারো মতে কুণ্ডলিনীর মধ্যে, কারো মধ্যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গের মধ্যে, পরমা (অঘটনঘটনপটীয়সী

কলানাদশক্তিরূপা) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা অতি-কুশলা (সৃষ্টিসম্পাদনযোগ্য নৈপুণ্যবতী) পরা (উৎকৃষ্টা) কলা অর্থাৎ শক্তি অবস্থান করছেন। এঁর দীপ্তির ধারা ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ পর্যন্ত সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়। ইনি নিত্যানন্দ থেকে পরম্পরারূপে আবির্ভূত সুধাধারা ধারণ করেন অর্থাৎ নিত্য আনন্দরূপ ব্রহ্ম থেকে বিন্দু, বিন্দুর পর আজ্ঞাচক্র, তারপর বিশুদ্ধ চক্র, তারপর অনাহত চক্র এইভাবে মূলাধার পর্যন্ত বেগে প্রবহমান অমৃতধারা ধারণ করেন। এঁর থেকেই নিত্যজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। অথবা তত্ত্বজ্ঞান হলেই সাধকের হৃদয়ে এর প্রকাশ হয়। এই পরমেশ্বরী সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে আছেন।

তরুণ সাধকটি এবার নতুন শ্লোক আরম্ভ করলেন :

"ধ্যাত্বৈতন্মূলচক্রান্তরবিবরলসৎকোটিসূর্য্যপ্রকাশাং
বাচামীশো নরেন্দ্রঃ স ভবতি সহসা সর্ব্ববিদ্যাবিনোদী।
আরোগ্যং তস্য নিত্যং নিরবধি চ মহানন্দচিত্তান্তরাত্মা
বাক্যৈঃ কাব্যপ্রবন্ধৈঃ সকলসুরগুরূন্ সেবতে শুদ্ধশীলঃ॥

—অর্থাৎ ?

তরুণ সাধকটি বললেন, এই মূলাধার চক্রের অভ্যন্তরস্থিত ত্রিকোণের মধ্যে অবস্থিত গহ্বরে বর্তমান কোটি সূর্যের প্রকাশতুল্য প্রকাশশালিনী কুণ্ডলিনী দেবীকে চিন্তা করে সাধক মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। এবং শীঘ্রই সমগ্র বিদ্যানুশীলনজনিত আনন্দ অনুভব করতে পারেন। তিনি নীরোগ থাকেন, এবং অন্তরাত্মা সর্বদা মহানন্দ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। এই ধরনের শুদ্ধভাব সাধক কাব্যঘটক বাক্যের দ্বারা সমস্ত দেবগণকে ও গুরুজনকে সেবা করেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, এ-তো সবই প্রতীক, তবে এই প্রতীকের মধ্যে যে কুণ্ডলিনী তিনি কি করে সাধককে সৌভাগ্য দান করতে পারেন ?

তরুণ সাধকটি বললেন, ঐ কুণ্ডলিনী প্রতীক বটে তবে অনস্তিত্ব নন। তিনিই হলেন বস্তুজগতের ধাত্রী শক্তি। তিনিই সব ধারণ করে আছেন। যে পথে তিনি কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়েছেন, সেই পথেই

যদি তাঁকে ফেরত পাঠানো যায় তাহলেই সমস্ত সৃষ্টির উৎসমুখে চলে যাওয়া যায়।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল দুধচটির সেই সন্ন্যাসীটির কথা। তিনি আমাকে বলেছিলেন—'হিমালয়ের চূড়ার দিকে ঠেলে তুলতে হবে গঙ্গাকে, পারবি?' গঙ্গাকে বিপরীত দিকে ঠেলে তোলার অর্থ কি এখন বুঝতে পারলাম। কিন্তু এই প্রতীক সর্পিণীকে কি করে উপরে তোলা যাবে? কথাটা তরুণ সাধককে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, সর্পিণী প্রতীক বটে, কিন্তু এই সর্পিণীতন্ত্রের অন্তরালে যে শক্তি, তা মিথ্যে নয়। সেই শক্তিকে উপরে উঠানো যায়।

কথাটা আমার কেমন অবিশ্বাস্য বোধ হল, তাই বললাম,

—সেটা কি করে সম্ভব?

তরুণ সাধকটি বললেন, ব্যারোমিটারের পারা তাপে উপরে ওঠে, ওঠে না?

বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, মূলাধার অঞ্চলে চাপ সৃষ্টি হলেই এই চৈতন্য-শক্তিও ঊর্ধ্বে উঠে যায়। এবং যথার্থ মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়েই ওঠে।

বললাম, মূলাধারে তাপ সৃষ্টি করা যাবে কি করে?

—ন্যাস, প্রাণায়াম ও যোগের সাহায্যে।

আমি বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তা লক্ষ্য করে তরুণ সন্ন্যাসীটি বললেন, আপনি বোধহয় খুব পরিষ্কার হতে পারছেন না এ ব্যাপারে, না?

বললাম, আপনি যথার্থই বলেছেন।

—কিন্তু এ খুবই সত্য জানেন? এই সর্পিণীকে ঊর্ধ্বে ওঠানো যায়, এবং তা ওঠানো গেলেই চূড়ান্ত সিদ্ধি।

আমার অবচেতন কিংবা অচেতন মনে বোধহয় তবুও কোথাও অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হচ্ছিল। তরুণ সন্ন্যাসীটি তা লক্ষ্য করে সামান্য একটু হাসলেন, কোন কথা বললেন না। উঠে মঠের মধ্যে চলে

গেলেন। তারপর দেখি একটি হরিণের চামড়ার আসন এনে তা বিছিয়ে তাতে বসলেন। আসনের উপর বিশেষ ভঙ্গি করে শিরদাঁড়া খাড়া করলেন। মনে হল গুণে গুণে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিলেন, প্রশ্বাস ত্যাগ করলেন। একবার মনে হল কণ্ঠদেশ বায়ু পূর্ণ করে গুহ্যদ্বার সংকুচিত করলেন। যেন ভেতর থেকে কিছু বাইরে যাচ্ছিল তার পথ রুদ্ধ করে দিলেন। মনে হল সারা শরীরে তাঁর রীতিমত স্বেদবিন্দু নির্গত হতে লাগল। মনে হল উর্ধ্ব দেহ থেকে কিছু একটা নেমে দেহের নিচের দিকে গেল। নিচের দিক থেকে কি একটা উঠে তাকে টেনে ধরল। যেন নিম্ন উদরে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটল। যেন একটা বিদ্যুৎচমকের মত আলো দেখতে পেলাম আমি। মাথার পেছনটাতেও উজ্জ্বল একটা সূর্য বৃত্ত রচনা করে জ্বলতে লাগল। যেন একটা সূক্ষ্ম তীব্র আলোর রেখা বিদ্যুৎচমকের মত নিম্নদেহ থেকে উঠে উর্ধ্বে চলে গেল। কণ্ঠ পর্যন্ত যেন সেই আলোর রেখার উর্ধ্বগতি আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। অদ্ভুত এক ব্যাখ্যার অতীত দ্যুতি ঝলমল করতে লাগল! কি করছেন তরুণ সাধকটি? কুণ্ডলিনী শক্তি যে সত্যিই জাগরিত হয় তা দেখাবার জন্যই কি অমন করছেন? কি করে মূলাধারে তাপ সৃষ্টি করা যায় সে কথাই আমি তাঁকে বলেছিলাম। তিনি কি ন্যাস, প্রাণায়াম ও যোগাসনের সাহায্যে সেই তাপ সৃষ্টি করে আমাকে দেখিয়ে দিলেন? সুন্দর এক জ্যোতির্ময় পুরুষ বলে তাঁকে মনে হতে লাগল আমার। আশ্চর্য! ক্রমশঃ তাঁর দেহ যেন একটা দেহাতীত আলোর রশ্মির মত সূক্ষ্ম হয়ে যেতে লাগল। এক সময় আমার মনে হল, একটা সূক্ষ্ম আলোর ঢেউয়ের মধ্যে সব কিছুই মিলিয়ে গেল। এমন অলৌকিক ঘটনা দেখে আমি বাক্য হারিয়ে ফেললাম। বিস্ময়ের আমার সীমা থাকল না।

বিস্ময়াহত একটা ছোট ছেলের মত আমি বসে রইলাম কখন তিনি আবার দেখা দেন সেই জন্য। ছেলেরা জাদুকরের হাতে লুকানো বল বা মার্বেলের প্রত্যাগমনের আশা করে যেমনভাবে অপেক্ষা করতে থাকে, আমিও তেমনই সাগ্রহ অপেক্ষা নিয়ে তরুণ সাধকটির শূন্য আসনের

দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অনেক, অনেকক্ষণ চলে গেল, তিনি আর ফিরে এলেন না। বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে দেখলাম, পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে হলুদ রঙের রোদ দিনশেষের আলপনা আঁকতে আরম্ভ করে দিয়েছে পাহাড়ের গৈরিক ঘাসের ডগাতে। হতবুদ্ধি এক জরদ্গবের মত আমি উঠে দাঁড়ালাম। এ লজ্জার যেন আমার সীমা নেই। একটা পরাজিত ব্যর্থ সৈনিকের মত আমি ফিরতে লাগলাম। ফেরার মুখেও বার বার সেই আসনটার দিকে তাকাতে লাগলাম। পাহাড়ী টিলার মাথা ছেড়ে নিচের ধাপে নামব, আর একবার ফিরে তাকালাম। তাকিয়ে যেন আমার অন্তরাত্মা থর-থর করে কেঁপে উঠল। স্পষ্ট দেখলাম, সেই আসনটার উপর সম্পূর্ণ ঋজু ভঙ্গীতে একটা উজ্জ্বল বর্ণের সাপ লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন একখণ্ড দেহাতীত বিদ্যুতের রেখা। দেখতে দেখতে সে রেখাও মিলিয়ে গেল। বোধহয় আমার অবিশ্বাস ও দোদুল্যমান-চিত্ততাই আমাকে একটা গুহ্যতত্ত্বের মুখোমুখি এনেও তাকে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে দেখার সুযোগ দিল না! এই সর্পরহস্য আবার চূড়ান্ত-রূপে ভেদ হবে কবে কে জানে! তবে এ রহস্য ভেদ না হওয়া পর্যন্ত আমার অন্তরাত্মা কখনও স্থির থাকবে না জানি। অনেক কিছুই জানার ছিল, জানা হল না। অদৃশ্য শক্তি কী যে খেলা খেলছে আমাকে নিয়ে কে বলবে! এ-সাপের যথার্থ স্বরূপ কি আমি নিজে বুঝতে পারব?